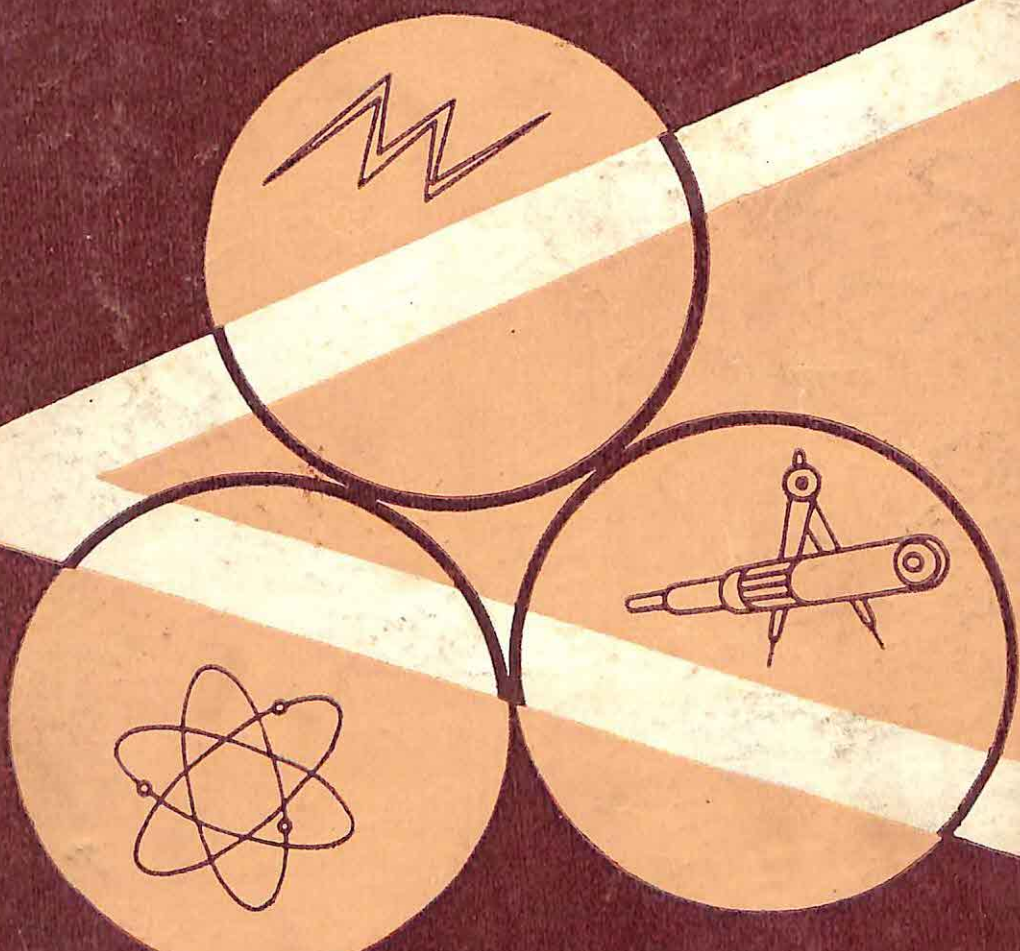
সুব্রত বড়ুয়া

বিজ্ঞানের ইতিকথা
সন্ধানী মানুষ



বিজ্ঞানের ইতিকথা ঃ সন্ধানী মানুষ

[অগ্রণী ব্যাঙ্ক শিশুসাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত]

সুব্রত বড়ুয়া

মুক্তধারা

মুক্তধারা ১০৪৬
প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা-১
বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪
দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮৬
প্রচ্ছদ-শিল্পী : মামুন কায়সার

মুদ্রাকর :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা-১
বাংলাদেশ

মূল্য : সাদা : ৪০·০০ টাকা
লেখক কাগজ : ৩০·০০ টাকা

BIJNANER ITIKATHA : SANDHANI MANUSH
[The Story of Science and the Scientists]
By Subrata Barua.
Second Edition : April 1986
Cover Design : Mamun Quaiser
Publisher : C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj Dhaka-1
Bangladesh

Price : Whiteprint : Taka 40·00
Lekhakprint : Taka 30·00

শিশুকিশোর আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ
রোকনুজ্জামান খান (দাদাভাই)
ও
অগ্রণী বিজ্ঞানসাধক
ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতীকে
আন্তরিক শ্রদ্ধার সাথে

প্রাসঙ্গিক নিবেদন

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হওয়ার পর এ বইটি মাত্র এক বছরের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। দীর্ঘ এক বছরেরও পর মুক্তধারার সৌজন্যে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। দ্বিতীয় সংস্করণে বইটি যথাসম্ভব পরিমার্জিত ও সংশোধিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বইটির কলেবরও অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

'মুক্তধারা'র প্রাণপুরুষ চিত্তদা ও তাঁর কর্মীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

সুব্রত বড়ুয়া
১৬ই এপ্রিল, ১৯৮৬

প্রাসঙ্গিক নিবেদন
প্রথম সংস্করণ

এ যুগের মানুষ হিসেবে বিজ্ঞান আমাদের জীবনে অপরিহার্য। আর সে কারণেই বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চা আমাদের জীবন ও জাতীয় অগ্রগতির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। পৃথিবীর সবদেশে আজ বিজ্ঞান-চর্চা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তাই, জাতীয় শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পুরোভাগে স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর আরোপ করা হয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। এই বিশেষ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে, বলতে পারি, বিজ্ঞানচর্চার প্রকৃত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যে একদিকে যেমন শিক্ষায়তনসমূহে বিজ্ঞানশিক্ষাকে যুগোপযোগী করা প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান-চর্চার বিশেষ আবহ সৃষ্টির প্রয়োজনও সমধিক। এজন্যে চাই বাংলাভাষায় প্রচুর বিজ্ঞান-বিষয়ক বই, যে বইয়ের মাধ্যমে বাংলা-ভাষাভাষী কিশোর ও তরুণরা পরিচিত হবে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে। দুঃখের কথা, এমন বইয়ের সংখ্যা স্বল্প। তার প্রকাশের পরিমাণও নগণ্য। আমার এ বইটি এই অভাব পূরণের পথে একটি নগণ্য পদক্ষেপ মাত্র। উদ্দেশ্য ছিলো, বিজ্ঞানের ইতিহাসকে সংক্ষিপ্ত-ভাবে তুলে ধরা, যাতে আমাদের কিশোর ও তরুণরা বিজ্ঞানচর্চার একটি ধারাবাহিক পরিচিতি লাভ করতে পারে। সে লক্ষ্য সম্পূর্ণ অর্জিত হয়েছে এমন দাবি করার দুঃসাহস আমার নেই। তবু, এ বই পড়ে যদি আমাদের বিজ্ঞানপিপাসু কিশোর-কিশোরীরা বিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্যমাত্র উৎসাহও অনুভব করে তাহলেই নিজের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

'ধানশালিকের দেশ' পত্রিকার প্রথম সহ-সম্পাদক মরহুম হাসান জান আমাকে এই বই লিখতে উৎসাহ দান করেছিলেন সর্বাধিক। তিনি আজ নেই। তাঁর পবিত্র স্মৃতি আমাকে এ বই সম্পূর্ণ করতে প্রেরণাদিয়েছে নিরন্তর। তাঁকে স্মরণ করি শ্রদ্ধার সাথে। তাঁর পর 'ধানশালিকের দেশ'-এর সহ-সম্পাদক কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন

ধারাবাহিকভাবে এ লেখা ছাপার ব্যাপার আন্তরিক যত্ন নিয়েছেন এবং বইটি দ্রুত রচনা করার জন্যে নিরন্তর তাগিদ দিয়েছেন। নিছক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। এছাড়া আরো অনেকে আমাকে এ ধরনের বই লেখার জন্যে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের প্রতিও জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। বইটি মুদ্রণের ব্যাপারে বাংলা একাডেমী প্রেসে কর্মরত সহকর্মীরা বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। তাঁদের শুভেচ্ছার ঋণ অপরিশোধ্য।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় বাংলাদেশের অবদান হোক অবিস্মরণীয়—এ কামনা করেই বইটি তুলে দিচ্ছি বাংলাদেশের বিজ্ঞানপিপাসু কিশোর কিশোরীদের হাতে।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪

সুব্রত বড়ুয়া

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষ খেকো বাঘ

আমাদের দেশ বাংলাদেশ। আমরা বাংলাদেশের মানুষ। এ দেশের নদ-নদী, আকাশ-বাতাস আর মাটির সাথে আছে আমাদের আজন্ম পরিচয়। এ দেশের ভৌগোলিক পরিচয় আমরা জানি আর জানি এদেশের ইতিহাস। কিন্তু শুধু দেশের পরিচয়ে সন্তুষ্ট হতে পারি না আমরা। আমরা জানি, বাংলাদেশের মানুষ সমগ্র মানবজাতিরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষ ছাড়াও আরো কতো প্রাণী আছে এ জগতে। হ্যাঁ, বিচিত্র এই পৃথিবী, বিচিত্রতর তার সৃষ্টির রহস্য। আর এই পৃথিবী ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেই আমরা পৌঁছে যাই সৌরমণ্ডলে, পৃথিবী সেই সৌরমণ্ডলের অনেক গ্রহের একটি গ্রহ মাত্র। অন্যদিকে সৌরমণ্ডল অনাদি অনন্ত মহাবিশ্বের নগণ্য এক অংশ মাত্র। মহাবিশ্ব আর সৌরমণ্ডল কথা দু'টি আমাদের মনে রাখতে হবে বৈকি। তেমনি আমরা যদি যাই প্রাণিজগতে, সেখানেও দেখি অপূর্ব রহস্যময় বিচিত্র এক জগৎ। আর যদি যাই প্রকৃতির রাজ্যে, তাহলে সেখানেও মুখোমুখি হয়ে পড়ি বিশাল-বিস্তৃত এক স্বপ্নময় রহস্যভাণ্ডারের। যতোই এই রহস্যময় জগতের মধ্যে এগোতে থাকি ততই নতুন নতুন বৈচিত্র্য আর বিস্ময় এসে পথরোধ করে দাঁড়ায় আমাদের সামনে। আমরা অবাক হই, হতবাক হই বিস্ময়ে—জানতে চাই, আরো জানতে চাই—আরো জানতে—যেন জানার কোনো শেষ নেই, শেষ নেই এই বিস্ময় আর বৈচিত্র্যের।

আর এই জানতে চাওয়ার সাথে সাথে আমাদের মনে শুধু জেগে ওঠে নতুন নতুন প্রশ্ন। কত কি আছে জানার। এই বিশ্বজগতটা কি, সৌরমণ্ডলটাই বা কোথায়। রাতের আকাশে মিটমিট করে জ্বলে যে তারা, কোথায় তাদের ঠিকানা। আজো মানুষের এই সন্ধান শেষ হয় নি। সে শুধু খুঁজেই চলেছে নতুন নতুন তত্ত্ব, নতুন নতুন তথ্য। এগিয়ে চলেছে সে প্রকৃতি ও জীবনের পরম সত্য আবিষ্কারের সন্ধানে।

যদি বলি—এরই নাম বিজ্ঞান, তাহলে কি তোমরা আঁত্‌কে উঠবে? বিজ্ঞান মানেই তো সেই অঙ্ক, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা আর জীববিদ্যার কচকচি। অর্থাৎ সেই ভয়ানক পড়ার বইয়ের রকমারি কথার ঝামেলা, স্কুলের ক্লাশে স্যারের গম্ভীর মুখ, ল্যাবরেটরীর কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্রপাতির বিদঘুটে জগৎ। আর পরীক্ষার আগের রাতের সেই নানান ঝামেলা মুখস্থ রাখার সংগ্রাম। তারপর মাথার মধ্যে কিলবিল করতে-থাকা সেই হরেক রকম জিনিস পরীক্ষার হলে নিয়ে গিয়ে কোনো রকমে বের করে দিয়ে আসা।

না, আসলে কিন্তু বিজ্ঞান তেমন কিছু জলজ্যান্ত মানুষ খেকো বাঘ নয়। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি সে আমাদের এই চার পাশের জগৎটারই কথা—কোনোটা আমরা দেখি, কোনোটা আমরা দেখি না। যেমন ধরা যাক তোমার পছন্দ রকমারী সুন্দর সুন্দর ছবি, ছড়া আর গল্পে ভরা একটি বই। ভেবে দেখা যাক—তোমার এই বইটি কেমন করে তৈরি হলো। বইটাতে অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন। আর সেগুলো ছাপা হয়েছে বেশ তক্‌তকে ছকঝকে কাগজে। কিন্তু এই ছাপা হওয়ার পেছনে কতজন মানুষের কতদিনের শ্রম আছে তা কি তোমরা জানো? যেমন ধরা যাক, এই কাগজের কথা। কাগজ কি প্রথম থেকেই এই পৃথিবীতে ছিল? আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে পৃথিবীর মানুষ কি কাগজ ব্যবহার করতো? পঞ্চাশ হাজার। পঞ্চাশ হাজার কথাটা অবশ্য বেশ বিরাট এক ব্যাপার বৈকি। পাঁচের পিঠে একটা শূন্য দিলে হয় ৫০। আর পঞ্চাশের পর আরো তিনটে শূন্য দিলে হলো পঞ্চাশ হাজার। এও একটা অঙ্ক বৈকি।

অথবা ধরা যেতে পারে এই অক্ষরগুলোর কথা। আমাদের বহুকাল আগের পূর্বপুরুষরা কি এই রকম অক্ষর লিখতে পারতো? অথবা এমনি ছাপার যন্ত্র কি তাদের কাছে ছিল? এসব কথার উত্তরে আমরা বলতে পারি, আমাদের এই পৃথিবীতে এমন একটা সময় ছিল যখন কাগজের আবিষ্কার হয়নি, ছাপার যন্ত্র ছিল না এবং এমন কি তখন মানুষের নিজেদের কোনো ভাষাও ছিল না।

কতদিন—ক' বছর আগে এমনটি ছিল? এর হিসেবটা করতে গেলে কিন্তু শুধু খাতা আর কলম নিয়ে বসে গেলে চলবে না। তার সাথে আরো অনেক কিছুর দরকার।

আমরা আমাদের এই গল্পটাতে ইতিহাসের সেই কাহিনীই বলবো। না—ইতিহাস মানে শুধু রাজা-রাজড়ার কাহিনী নয়—এ হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীর ইতিহাস—মানুষের ইতিহাস, বিজ্ঞানের ইতিহাস।

তুমি যেমন তোমার স্কুলের ক্লাসে এক মিনিট চুপ করে বসে থাকতে চাও না—সারাক্ষণ শুধু এটা-ওটা নিয়ে দাপাদাপি করে বেড়াতে চাও, মানুষের এই ইতিহাসের ব্যাপারটাও কিন্তু আসলে তাই। জন্মের পর থেকে মানুষও তেমনি এক মিনিট স্থির হয়ে থাকেনি—সে সারাক্ষণ এটা-ওটা করে বেড়িয়েছে। প্রতি মুহূর্তেই সে নিজের এই বেঁচে থাকাটাকে আরো সুন্দর ও সহজ করার চেষ্টা করেছে। কিংবা অজানা অনেক কিছুই তাকে ডেকে দিয়েছে হাতছানিতে। সে প্রতি মুহূর্তেই এগিয়ে গেছে নতুন কিছুর সন্ধানে।

আবিষ্কারের হাতছানি

লোকে বলে, প্রয়োজনই হচ্ছে আবিষ্কারের প্রথম সোপান। কথাটি খুব সত্য। এই যেমন দুপুর বেলায় মা যখন ঘুমিয়ে, তুমি তখন অই উঁচু তাকের ওপর থেকে বিস্কিটের টিন অথবা আচারের শিশিটা নামাবার জন্যে হাঁস-ফাঁস করতে থাকো—আর হঠাৎ মনে পড়ে যায় পড়ার ঘর থেকে ছোট টুলটা আনলেই তো বেশ খানিকটা লম্বা হওয়া যায়। তখনই দে ছুট। মানুষও তেমনি এই প্রয়োজনের তাগিদেই অনেক কিছুই আবিষ্কার করেছে। তবে সে-সব আবিষ্কার তোমার অই পড়ার ঘর থেকে টুল বয়ে আনার মতো অমন সহজ কোনো ব্যাপার নয়।

শুধু প্রয়োজনের কারণেই মানুষের অনেক আবিষ্কার ঘটেছে এ কথাটি অবশ্য পুরোপুরি সত্য নয়। অনেক সময়ে অনেক কিছুই আকস্মিকভাবেও ঘটেছে, শুধুমাত্র কৌতূহলের কারণে।

মানুষের এই নতুন নতুন আবিষ্কারের কথাটাই আমাদের এই ইতিকথায় তোমাদের আমি বলার চেষ্টা করবো। আর মনে রেখো এসব কাহিনী কিন্তু তোমার অই ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথার গল্প নয়।

আর এ কথাও ঠিক বিজ্ঞানের এই ইতিহাস কিন্তু কোনো বিশেষ শুভ লগ্নে শুরু হয়নি। শুরু হয়েছে মানুষের জন্মের শুরু থেকেই। একথা সত্য, পৃথিবীতে মানুষের জন্মের আগেও অন্য আরো বহু রকম

প্রাণী ছিল, অনেক গাছপালা ছিল, তাদের অনেকগুলিই আজকে আর হয়তো নেই। আর শুধু তা নয়, পৃথিবীর এই জন্মের পর থেকে পৃথিবীটারও অদল-বদল ঘটেছে বহুবার।

অই দেখ—আবার পৃথিবীর জন্মের কথা এসে গেলো। পৃথিবী কি মানুষ নাকি? তার আবার জন্ম কিসের! সেতো চিরকাল এমনিভাবেই ছিল আর ভবিষ্যতেও এমনিভাবেই থাকবে। না—মোটেও সত্য কথা নয়। পৃথিবী চিরকাল এমন ছিল না। আর মজার কথা কি, এমন এক সময় ছিল—যখন পৃথিবী বলে কোনো কিছু ছিলই না।

আমরা আগেই বলেছি, পৃথিবী সৌরমণ্ডলের একটি গ্রহ। সৌরমণ্ডল অর্থাৎ সূর্যের চারপাশে সূর্যকে ঘিরে যে-সব গ্রহ-উপগ্রহ আছে, যারা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে অর্থাৎ সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ায় তাদের সবকিছুকে নিয়ে আমাদের এই সৌরমণ্ডল। বিজ্ঞানীরা আবার কায়দা করে সূর্যের নাম দিয়েছে নক্ষত্র। তাঁরা বলেন, মহাবিশ্বে সূর্যের মতো এমন বহু নক্ষত্র আছে।

এক সময়ে লোকের ধারণা ছিল—সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। আর এ ধারণা তারা খুব গভীরভাবে বিশ্বাসও করতো। এমনকি বহুকাল আগে ইতালীর এক বৈজ্ঞানিক সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে এ কথা প্রচার করায় দণ্ডিতও হয়েছিলেন। আজকের অবস্থা অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন কেউ যদি সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে এমন কথা বলে তাহলে তাকেই বরং ধরে বেঁধে পাগল বলে পাবনার হেমায়েতপুর মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে চিকিৎসার জন্যে।

তাহলে দেখো, ধীরে ধীরে অনেক কিছু সম্পর্কে মানুষের ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। আর এই পরিবর্তনের পেছনে আছে মানুষের এই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মানুষকে সত্য কথাটি জানতে শেখায়, নতুন নতুন চিন্তাভাবনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মানুষের এই জানার ইতিহাসই আসলে বিজ্ঞানের ইতিহাস।

আমরা বিজ্ঞানের এই ইতিহাস বলতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ের কাছে ফিরে যাবো। আর সে সব সময়ে মানুষ কি করেছে, কি করতো—সে সবও জানার চেষ্টা করবো।

আসল কথা—আমরা আজ যে যুগে বাস করছি, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সব সুবিধা আর উপকরণ আমরা ভোগ করছি—এসব

কিছু তো আর একদিনে হয়নি। এর পেছনে আছে বহু মানুষের বহু বছরের সাধনা। কেউ কেউ সারাজীবন ধরে এ সাধনার ভেতরেই ডুবে ছিলেন। জগৎ ও জীবনের পরম সত্যটিকে আবিষ্কার করার জন্যে তাঁরা তাঁদের জীবনটিই উৎসর্গ করে গেছেন।

অতএব এদের কথা—বিজ্ঞানের এই সত্যসন্ধানী আবিষ্কারের কথা বলতে গেলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হয় আজ থেকে বহুকাল আগে —সেই আমাদের এই শস্য শ্যামলা পৃথিবীর জন্মেরও আগে। তারপর পৃথিবীর জন্ম, পৃথিবীতে প্রাণের অবির্ভাব, মানুষের জন্ম আর সভ্যতার অগ্রগতির পথে মানুষের এই চিরকালের সাধনা—এর সবকিছুকেই আমাদের অবশ্যই বিশদভাবে জানতে হবে।

মজার কথা কি জানো—প্রাচীনকালে মানুষ বিশ্বাস করতো, চারটি মৌলিক উপাদান দিয়ে আমাদের এই সৌরমণ্ডলের সবকিছু গঠিত। আর এগুলো হচ্ছে—পানি, মাটি, আগুন এবং বায়ু। অর্থাৎ পৃথিবীর সব জিনিসই আসলে এই চারটি উপাদান দিয়ে তৈরি। কিন্তু এখন আমরা জানি, এ কথা সত্য নয়। আমাদের কাছে এখন মৌলিক পদার্থের যে তালিকা আছে তাতে আছে শতাধিক নাম। আমরা আমাদের চার-পাশে যে সব বস্তু দেখি তার সবই এ সব মৌলিক পদার্থ দিয়ে গঠিত। কিন্তু এই সত্যটা আবিষ্কৃত হয়েছে বহুকাল পরে। এমনিভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের বহু ধারণার হয়েছে পরিবর্তন।

কিন্তু কথা হচ্ছে—পৃথিবীতে বিজ্ঞানের যে ক্রম-অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার বিশদ এবং নির্দিষ্ট কোন কাঠামো নেই। অর্থাৎ ছক কেটে ঘর বেঁধে এসব কাজ হয়নি। একেক দেশে একেকটি কাজ হয়েছে, ঘটেছে এক একটি আবিষ্কার। তার পরে সেই আবিষ্কারই হয়ে উঠেছে পৃথিবীর সকল মানুষের সম্পদ।

তোমরা নিশ্চয়ই অনেক বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম শুনেছ। যেমন আইনস্টাইন, নিউটন, রাদারফোর্ড, ভেঙ্কটরমন, গ্যালিলও, ফ্যারাডে, মার্কনী, জগদীশচন্দ্র বসু এবং আরো অনেক।

আমাদের এই কাহিনীতে আমরা এই বিজ্ঞানীদের কথা বলবো। বলবো—তাঁরা কোন দেশের লোক ছিলেন, কি কাজ তাঁরা করেছেন আর তার ফলে আমাদের এই বিজ্ঞান-সাধনার কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে।

এই কাহিনী আসলে যুগ যুগ ধরে মানুষ আলোকের যে সাধনা করে এসেছে তারই কাহিনী। আর আমরা তো চাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে পৃথিবীর সব অন্ধকার হোক দূরীভূত, আলোয় আলোকময় হয়ে উঠুক আমাদের এ মাটির ভুবন।

বিজ্ঞানের জন্ম

কখন কোন্ তারিখ থেকে মানুষের বিজ্ঞানচর্চার শুরু সে-কথা কিন্তু বিজ্ঞানের কোন ইতিহাসে লেখা নেই। আর লেখা থাকবেই বা কি করে। আগে থেকে দিন-তারিখ-ক্ষণ ঠিক করে শুভদিনে শুভক্ষণে তো আর মানুষ বিজ্ঞানচর্চা শুরু করতে বসেনি। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে, প্রকৃতিকে ভালোবেসে, প্রকৃতির উপাদানের ওপর নির্ভর করে মানুষ বেঁচে আছে, বেঁচে আসছে। বেঁচে থাকার এই প্রয়াসের সবটুকুই বিজ্ঞান নয়, কিন্তু সচেতনভাবে না হলেও মানুষ তার সেই আদ্যিকালের জীবন থেকেই উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে আসছে এবং এই উদ্ভাবন ও প্রয়োগের ওপরই মানুষের আজকের আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার মূল ভিত্তিভূমি হয়েছে রচিত।

কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ করতে গেলে একটি বিষয়ে আমাদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে, আর তা হচ্ছে বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে প্রকৃতি ও জীবনের সত্যানুসন্ধান এবং প্রাত্যহিক জীবন ধারণের প্রয়োজনে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ। এ কথাটাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, যেমন—কৃষিকাজের প্রয়োজনে নদীর পানি ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের প্রথম প্রয়াস। নদীতে বাঁধ দিয়ে, ছোট ছোট খাল কেটে অথবা অন্যভাবে পানিকে কৃষিকাজে ব্যবহারের অনেক চেষ্টার কথা আমরা শুনতে পাই। এই কাজটা হচ্ছে প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ উদ্ভাবনী ক্ষমতার মাধ্যমে প্রকৃতির সম্পদকে মানুষের নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা। অন্যদিকে পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘোরে এটা হচ্ছে সত্য। এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দৃষ্টান্ত ব্যবহার করাই হচ্ছে মানুষের বিজ্ঞানচর্চা।

বেঁচে থাকার জন্যে

এখানে প্রথম ব্যাপারটি আসলে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চা নয়। এটা ছিলো মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়াসে নিজেদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগ। এর

মধ্যে মানুষের জ্ঞান, জ্যামিতিক হিসেব, বিভিন্ন অবস্থায় পানির চাপের পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় ছিল বটে—কিন্তু তার সবকিছুই মোটামুটি বাস্তব প্রয়োগের ওপরই ছিল নির্ভরশীল। অন্যদিকে পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর নিজের কক্ষপথে ঘুরছে—এখানে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের তেমন কোনো অপরিহার্য কিছু ছিল না। দ্বিতীয় প্রয়াসটির মধ্যে মানুষের কল্পনা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার বৃহত্তর সমন্বয় ঘটেছে।

এই দ্বিতীয় বিষয়টির মাধ্যমেই বস্তুত বিজ্ঞানচর্চার শুরু।

আমরা কাল হিসেবে বিজ্ঞানের ইতিহাসকে চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি। বিখ্যাত গবেষক জর্জ সার্টনও তাঁর বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই বিষয়টিকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। এ ভাগগুলো হচ্ছে—প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী এবং অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আজকের সময় পর্যন্ত।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ জোয়ার এসেছিল এবং চতুর্থ যুগে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। যুগান্তকারী সব আবিষ্কার ঘটেছে এ যুগেই। এমনকি এ যুগের অনেক আবিষ্কারের ফলে কোনো কোনো বিষয়ে আমাদের পূর্বের অনেক ধারণা আমরা বাতিল করতেও বাধ্য হয়েছি। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি—প্রাচীন যুগে বিজ্ঞানীরা সকল পদার্থের অর্থাৎ সকল কিছুর মৌলিক উপাদান বলে চারটি মৌলিক উপাদানের নাম ঘোষণা করেছিলেন। এগুলো হলো পানি, বায়ু, অগ্নি ও মাটি। আজকের দিনে আমরা অবশ্যই এই চারটি উপাদানকে সকল কিছুর গঠনকারী মৌলিক উপাদান বলে মানতে রাজী নই। কেননা, আমরা জানি—পদার্থের মৌলিক উপাদান সন্ধান করতে করতে আমরা এক রহস্যময় পারমাণবিক পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছি। সেখানে দেখা যাচ্ছে—প্রতিটি পদার্থই মূলত এক এক ধরনের মৌলিক এটম বা অণু দ্বারা গঠিত। আর এই অণু আবার প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রনের মতো পারমাণবিক কণার সমন্বয়ে গঠিত এবং বিভিন্ন পদার্থের গঠন বিভিন্ন রকমের হলেও প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন ইত্যাদি আসলে অভিন্ন। বিভিন্ন অণুর ক্ষেত্রে এদের সংখ্যা ও গঠনের পার্থক্য আছে শুধু। তাহলে বুঝতে পারি, আমাদের চারপাশে সবকিছুই আসলে হয়তো অভিন্ন উপাদানেই সৃষ্ট এবং বাইরের ভিন্নতা আসলে পারমাণবিক কণার সংখ্যার ভিন্নতা ও অণুর গঠনের বৈচিত্র্যের কারণেই।

এভাবেই পরবর্তী ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এমনকি অনেক সময়ে—এই পরবর্তী ধারণার আবার পরিবর্তন হয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি ও জীবনের রহস্য-সন্ধানে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। একটু আগেই বলেছি, বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনার সময় আমরা সমগ্র সময়কে চারটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এর মধ্যে প্রাচীন যুগ থেকেই অবশ্য আমাদের শুরু করতে হবে।

প্রাচীন যুগের প্রাচীন কথা

প্রাচীন যুগ বলতে আমরা কোন যুগকে বোঝাবো? এমনিতে আমরা জানি মানুষের ইতিহাসের প্রথম যুগ হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ। প্রাগৈতিহাসিক মানে ইতিহাসেরও আগে। ইতিহাস অর্থাৎ সন, তারিখ, মানুষের সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্র ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যে সময়কাল পর্যন্ত আমরা মোটামুটি কিছুটা স্পষ্ট ধারণা অর্জন করেছি। ইতিহাসের আলোচনার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে ইংরেজী সাল অনুসরণ করা হবে। খ্রীস্টাব্দ গণনা করা হয় যিশু খ্রীস্টের জন্মসাল থেকে। অর্থাৎ ১৯৭৬ সাল বললে আমরা বুঝতে পারি ১৯৭৬ বছর আগে যিশু খ্রীস্টের জন্ম হয়েছিল। যিশু খ্রীস্টের জন্মের পূর্বের সময়কালের হিসেব করা হয় সাধারণত খ্রীস্টপূর্ব শব্দটি ব্যবহার করে। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী বলা হলে আমরা বুঝে নেবো যে, যিশু খ্রীস্টের জন্মের চারশো বছর পূর্বের কথা বলা হচ্ছে।

প্রাচীন যুগের বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরবর্তী পর্যায়ে করবো। তবে এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার প্রাচীন যুগে বিজ্ঞানের যে সব তত্ত্ব ও তথ্যের কথা বলা হয়েছে তার অধিকাংশ হচ্ছে মূলত তত্ত্বীয় অর্থাৎ এর সবকিছু প্রধানত সে যুগের দার্শনিকবিজ্ঞানীদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাকে কেন্দ্র করেই। পৃথিবী, প্রকৃতি, বস্তু, জ্যোতিষ্কলোক ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা তাঁদের যে ধারণা প্রকাশ করেছেন, তার অধিকাংশই মূলত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই।

বিজ্ঞানী না দার্শনিক

এখানে একটা কথা তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছ যে আমরা প্রাচীন যুগের বিজ্ঞানীদের দার্শনিক-বিজ্ঞানী বলে অভিহিত করেছি। আজকের দিনে

দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীদের আলাদাভাবে দেখা হয়। প্রাচীন যুগে, আমরা আগেই বলেছি, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতার প্রধান কারণ হচ্ছে—সে যুগে প্রযুক্তি তথা ব্যবহারিক বিজ্ঞানচর্চার তেমন কোনো বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটে নি। আজকের দিনে যন্ত্রের অসাধারণ ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করছি, আগেকার দিনে তা সম্ভব ছিল না। বিজ্ঞানচর্চা ছিল মূলত সৃষ্টি ও প্রকৃতির রহস্যোদ্ধারের কারণেই এবং সে রহস্যোদ্ধারের প্রয়াসও ছিল অনেকটা চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে। সে কারণেই তাঁরা যতটা না বিজ্ঞানী ছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী ছিলেন দার্শনিক। কিন্তু আজকে বিজ্ঞানে যে বিষয়টিকে সত্য বলে বিবেচনা করা হবে তার সত্যতা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা যাচাই করে নিতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কোনো কিছুই চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে না। তাই আমাদের কালের বিজ্ঞানীরা কোনো আন্দাজ বা অনুমানের ওপর নির্ভর করে তাঁদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করেন না। প্রাচীন যুগের বিজ্ঞানীরা, সত্য বলতে কি, নির্ভেজাল বিজ্ঞানী ছিলেন না। দর্শন এবং বিজ্ঞানের মধ্যে তাঁরা কোনো বাস্তব সীমারেখাও টেনে দিতে পারেন নি।

সে যাহোক, প্রাচীন যুগের বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে বলতে গেলে কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে আমাদের প্রথমেই স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে। সে বিষয়গুলো হচ্ছে সে যুগের জীবন, তাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সমাজ-জীবন, কৃষি-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি। এসব জানা প্রয়োজন এজন্য যে, বিজ্ঞানের ইতিহাসের আবিষ্কারগুলো আসলে উপরের এই ব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন মানব সভ্যতার ক্রম-বিবর্তন সম্পর্কে জানতে গেলে আমরা জানতে পারবো মানুষ ক্রমে ক্রমে এক একটা যুগ অতিক্রম করে এসেছে এবং এই অতিক্রমের সময়ে মানুষের জীবন ধারণের অর্থাৎ সমাজ, রাষ্ট্র ও উৎপাদন ব্যবস্থারও হয়েছে পরিবর্তন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ থাকতো গুহায়—কঠিন পাথর ছিল তাদের জীবন ধারণের প্রধান সহায়। তারা পাথরের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে শিকার করতো। কাঁচা মাংস এবং বনের ফলমূলই ছিল তাদের খাদ্য। পাথরে পাথর ঘষে মানুষ যেদিন থেকে আগুনের ব্যবহার শিখেছে সেদিনই শুরু হলো মানুষের ইতিহাসের নতুন এক পর্যায়।

এর পরে মানুষ আস্তে আস্তে ধাতুর ব্যবহার অর্থাৎ লোহা-তামা ইত্যাদি ব্যবহার করতে শিখেছে, শিখেছে কৃষিকাজ। এভাবে জীবন-

ধারণের উপায়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞানেরও পরিবর্তন হয়েছে। এবং একই সঙ্গে মানুষের সমাজ-জীবনেরও হয়েছে পরিবর্তন।

প্রাচীন যুগের যে সব সভ্যতার কথা আমরা জানতে পাই তা ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়ানো। এবং সাধারণত দেখা যায় কোনো না কোনো নদীর তীরেই গড়ে উঠেছে সে যুগের সমৃদ্ধ নগরী। আর এই নগরীকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিলো বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতা।

এসব সভ্যতার মধ্যে গ্রীক, রোমান, মিশরীয় ও অ্যাসিরীয় সভ্যতার বিভিন্ন দিক এখনো গবেষকদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। প্রাচীন চীন এবং ভারতও ছিলো সভ্যতার কেন্দ্র। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও আসলে হয়েছে এই কেন্দ্রগুলোকে ঘিরে। পরবর্তী সময়ে আমরা গ্রীস, রোম, মিশর ইত্যাদি প্রাচীন সমৃদ্ধ দেশের বিজ্ঞানের চর্চা সম্পর্কে আলোচনা করবো। আর এ যুগকেই আমরা বলবো প্রাচীন যুগ। সময়ের হিসেবে এ যুগ খ্রীস্টপূর্ব সময়ের যুগ। তবে আমরা আগেই বলেছি, চতুর্থ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে আমরা প্রাচীন যুগ নামে অভিহিত করবো।

মনে রাখতে হবে, এই যুগ-বিভাগ আসলে বিজ্ঞানের ইতিহাসের যুগ-বিভাগ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই পৃথিবীর কথা

এইখানে এসে আমাদের একটু থমকে যেতে হচ্ছে। প্রাচীন সভ্যতা ও বিজ্ঞানচর্চার হিসেব নেওয়ার আগে একবার আমাদের এই পৃথিবীটা সম্পর্কে একটু-আধটু খোঁজ-খবর নিলে কেমন হয়? হ্যাঁ—আমাদের এই বহু পুরাতন পৃথিবীরও নিশ্চই এমন অনেক কথা আছে, যেগুলো আগেভাগে জানা থাকলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে আমাদের বেশ সুবিধে হবে। আবার এই পৃথিবীকে জানতে হলে জানা চাই সৌর-জগৎকে, সৌরজগতের খোঁজ নিতে গেলে জানতে হবে নক্ষত্রজগতকে। এ সম্পর্কে আজকের দিনেও জানার চেষ্টা শেষ হয়নি। নক্ষত্রজগত ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে নিত্যনতুন তত্ত্ব ও তথ্য প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করে চলেছেন বিশ্বের বিজ্ঞানীরা।

তাহলে আমরা অবশ্যই প্রথমে জানতে চাইবো—কতোদিনের পুরোনো এই পৃথিবী। কতো কোটি বছর আগে পৃথিবীর জন্ম। কিংবা সেই অনন্তকাল থেকেই পৃথিবী আছে এমনই? এককালে, আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের আগে, মানুষের ধারণা ছিল—পৃথিবী চিরকাল একরকম থাকবে। কিন্তু—এখন আমরা জানি, পৃথিবী চিরকাল একরকম ছিলো না, আর চিরকাল একরকম থাকবেও না। এই পৃথিবীতে চলেছে ভাঙা গড়ার এক অবিচ্ছিন্ন খেলা। সে-খেলায় মগ্ন থাকতে থাকতে পরিবর্তন হচ্ছে পৃথিবীর। পরিবর্তন হচ্ছে মহাবিশ্বের। প্রাকৃতিক এই পরিবর্তন আমরা খুব সহজে টের পাই না, কিন্তু আমাদের চোখের সামনে প্রায় অলক্ষ্যে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে পৃথিবীর অনেক কিছু।

লক্ষকোটি বছর

বিজ্ঞানীরা বলেছেন—মানুষ এবং সভ্যতার ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসের এক অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। সেজন্য, কয়েক বছর,

কয়েকশো বছর অথবা কয়েক হাজার বছর পৃথিবীর কাছে কিছুই না। পৃথিবীর হিসেব হয়, না লক্ষ বছরেও নয়, কোটি বছরে। পৃথিবীর এই সময়ের হিসেব নিয়ে মজার এক কাণ্ড করেছেন একজন লেখক। হিসেবটা অবশ্য একটা উপমার সাহায্যে দেওয়া।

অমল দাশগুপ্তের 'পৃথিবীর ঠিকানা' বইটিতে এমন একটি মজার হিসেব আছে—"একটা ছোট উপমা দিলে কথাটা পরিষ্কার হতে পারে। আমরা জানি, ঘড়ির মিনিটের কাঁটা পুরো এক পাক পুরো ঘুরে এলে ৬০ মিনিট। কল্পনা করতে হবে এই ৬০ মিনিট সময় ৩০ কোটি বছরের সমান। অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা প্রতি মিনিটে ৫০ লক্ষ বছর পার হচ্ছে।

"কথাগুলো যতো সহজে বলা গেল, তত সহজে কল্পনা করা চলে না। এক একটি মিনিট পঞ্চাশ লক্ষ বছরের সমান। প্রতি ঘণ্টায় ত্রিশ কোটি বছর। অর্থাৎ আধুনিক মানুষের ইতিহাস এই ঘড়ির কাঁটায় একেবারে এই মুহূর্তের ঘটনা। হিন্দু সভ্যতা বা মিশর সভ্যতার যুগ থেকে এই বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমাদের কাছে এক সুদীর্ঘকাল কিন্তু এই ঘড়ির কাঁটায় এক সেকেণ্ডেরও ভগ্নাংশ। এই ঘড়ির হিসেবে এক সেকেণ্ডের আগের যুগের মানুষও বন্য বর্বর জীবন-যাপন করেছে।

"এবার কল্পনা করা যাক এই ঘড়ির রাত ঠিক বারোটার সময় পৃথিবীর জন্ম হল। পৃথিবী তখন একটি আবর্তমান বস্তুপিণ্ড। কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। তারপর পৃথিবী ক্রমে তরল হয়েছে, ক্রমে জমাট বেঁধেছে। তৈরী হয়েছে পৃথিবীর আদিম সমুদ্র। কিন্তু তখনো প্রাণের উৎপত্তি হয়নি। সেই শুভ মুহূর্তটির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ভোর ছ'টা পর্যন্ত। সেই সময়েই পৃথিবীর সেই আদিম সমুদ্রে কতকগুলো অনুবীক্ষণ বিন্দুকে আশ্রয় করে প্রাণের জন্ম। তারপরে প্রথম শিরাদাঁড়াওলা প্রাণীর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সকাল পৌণে নটা পর্যন্ত। সকাল ন'টার সময় উভচর প্রাণীরা জল থেকে ডাঙ্গায় উঠে এসেছে। ৯টা আট মিনিটে সরীসৃপের জন্ম, ৯টা ২৩ মিনিটে ডাইনোসরের, ৯টা ২৫ মিনিটে স্তন্যপায়ী, ৯টা ৩৩ মিনিটে পাখী। আর মানুষ? মানুষ এসেছে এই মাত্র ৩৩ সেকেণ্ড আগে।"

একটু চেষ্টা করলেই এই উপমাটা থেকে পৃথিবীর বয়সটা আমরা বের করতে পারি। বলা হয়েছে, ৬০ মিনিট হচ্ছে ৩০ কোটি বছরের সমান। তাহলে রাত বারোটা থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত ক'কোটি বছর

হবে? অত্যন্ত সোজা হিসেব—মানে ৩০০কোটি বছর। এর সাথে মানুষের সভ্যতার ইতিহাস যোগ করলেই তো পৃথিবীর আজকের বয়সটা পাওয়া যায়। কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসতো মাত্র কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস। যেখানে কোটির হিসেব করছি আমরা সেখানে হাজারের হিসেবটা ধরলেই বা কি না ধরলেই কি।

তাহলে মোটামুটি পৃথিবীর বয়স ধরা যাক তিনশো কোটি বছরের মতো। কি বয়স! আমরা তো পঞ্চাশ ষাট বছর হলেই মানুষকে বুড়ো বলি—আর সেখানে এই তিনশো কোটি বছরের পৃথিবী। কি বলবো ওকে? আদ্যিকালের দাদীবুড়ি?

কিন্তু আসল কথাটা হলো পৃথিবীর বয়সের এই হিসেবটা কি করে পাওয়া গেল? হাঁ সেটাই আসল সমস্যা বটে। পৃথিবীর বয়স বের করার জন্যে বিজ্ঞানীদের কিন্তু কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। তাঁরা হিসেব করেছেন পৃথিবীর ভাঙ্গাগড়ার পর্যায়, হিসেব করেছেন সেই বহুকালের ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের বয়স, হিসেব করেছেন সেই মাটির স্তরে লুকিয়ে থাকা ফসিলের, সমুদ্রের পানির লবণের। আর সবশেষে বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য যে উপায়টি ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা। সে সব হিসেবের খুঁটিনাটি আলোচনা-সমালোচনা আমরা এখানে করছি না। তবে বিজ্ঞানীরা যদিও হিসেব করেছেন পৃথিবীর বয়স ৩০০ কোটি বছর—তবুও তাঁদের মধ্যে কিন্তু সংশয় এখনো আছে। তাঁদের ধারণা, সঠিক হিসেবে পৃথিবীর বয়স হবে চারশো থেকে পাঁচশো কোটি বছরের মধ্যে।

নবজীবীয় যুগ মধ্যজীবীয় যুগ

বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার সুবিধের জন্য প্রাণীর বিবর্তনকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বয়সকে কয়েকটি যুগে ভাগ করেছেন। এদের মধ্যে সর্বশেষ হচ্ছে 'নবজীবীর যুগ'। এ যুগ স্তন্যপায়ী জীবদের যুগ। এর শুরু প্রায় ৭ কোটি বছর আগে। পৃথিবীতে এখনো এই 'নবজীবীয় যুগ'ই চলছে। নবজীবীয় যুগের আগের যুগটির নাম 'মধ্যজীবীয় যুগ'। এটি হচ্ছে সরীসৃপদের যুগ। সরীসৃপ মানে যে সব প্রাণী বুকে হেঁটে চলাফেরা করে। ৯৯ কোটি বছর আগে এ যুগের শুরু। ৭ কোটি বছর আগে এই যুগটি শেষ হয়েছে।

পুরাজীবীয় যুগ

'মধ্যজীবীয়' যুগের আগের যুগটির নাম 'পুরাজীবীয়' যুগ। এই যুগ ছিল জীবজগতের প্রাথমিক যুগ। এই যুগেই মাছ জাতীয় প্রাণীদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। এই যুগ প্রায় ৩৪ কোটি বছর ধরে ছিল। এছাড়া —পুরাজীবীয় যুগের আগেও পৃথিবীর কোটি কোটি বছরের ইতিহাস আছে। এই কোটি কোটি বছরে পৃথিবীতে ছিল সামুদ্রিক গাছপালা। আর এর আগে এমন এক সময় ছিল যখন গাছপালা বা সবুজের চিহ্ন ছিল না এই পৃথিবীতে। তখন পৃথিবী ছিল গরম এক ধাতুপিণ্ড।

মোটামুটি এমনিভাবেই পৃথিবীর ইতিহাসটা আমাদের একটু জানা হয়ে যায়। এ জানা কিন্তু খুব ভালোভাবে জানা নয়। ভালোভাবে জানতে হলে পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের কিন্তু অনেক কিছুই জানতে হবে।

সে যাহোক। এর আগে আমরা মানুষের প্রাচীন সভ্যতার কথা বলেছিলাম। এই সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত মানুষের বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস।

মানব সভ্যতার আদি পর্ব

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা কোন্‌টি—এ নিয়ে এখনো অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্য মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, নীল নদের তীরের মিশর সভ্যতাই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা, আবার অন্যদের মতে টাইগ্রীস ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাই প্রাচীনতম সভ্যতা। অবশ্য প্রাচীনতম সভ্যতা নিয়ে যে বিতর্ক তাতে আমাদের খুব বেশী আগ্রহ নেই। আমরা শুধু জানতে চাই সে সময়ে বিজ্ঞানের কতটা অগ্রগতি হলো, সে যুগের মানুষের বিজ্ঞানচর্চার পরিধিই বা ছিলো কতটুকু।

যেমন প্রাচীন মিশরের বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে আমরা জানি—এই সময়ে মিশরে বিজ্ঞানের তথা গণিতের দু'টি বিষয়ে মিশরীয়রা মোটামুটি বেশ কিছু স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলেছিলো। এ দু'টি বিষয় হচ্ছে—জ্যোতি-বিদ্যা এবং গণিত। বিষয় দু'টি ছিল তাদের কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

নীলনদের বন্যার ফলে নদীর উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকায় পলি পড়তো। তখন ভূমি-চিহ্ন ঠিক রাখার জন্যই প্রয়োজন হতো জ্যামিতির অর্থাৎ গণিতের। এ ছাড়া বন্যা কখন দেখা দেবে—তা আগে থেকে জানার জন্য নক্ষত্রের অবস্থানের হিসেব করা ইত্যাদি কারণেই জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা হতো। কিন্তু এসব বিষয়ের চর্চা ছিলো প্রধানত ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। সে কারণেই মিশরীয়রা মোটামুটি একটি সৌর-ক্যালেণ্ডার তৈরি করেছিলো, এবং আকাশে নক্ষত্র ও তারকা ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয় করেছিলো। কিন্তু বিশ্বজগতের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তারা যেমন কিছু নতুন ধারণা দিয়ে যায়নি। তবে রসায়ন শাস্ত্রে মিশরীয়দের অগ্রগতির অনেক নজির আমরা পাই পিরামিডের মমী সংরক্ষণের মধ্যে।

অন্যদিকে গণিতের ক্ষেত্রে পাটীগণিত এবং জ্যামিতি বিষয়ে তারা বেশ কিছুটা অগ্রগতি সাধন করেছিলো। তারা যোগ, বিয়োগ, ভাগ জানতো। কিন্তু 'গুণ' করার বিষয়টি তাদের জানা ছিল না। তারা দশমিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলো, কিন্তু শূন্যের (০) ব্যবহার তারা জানতো না।

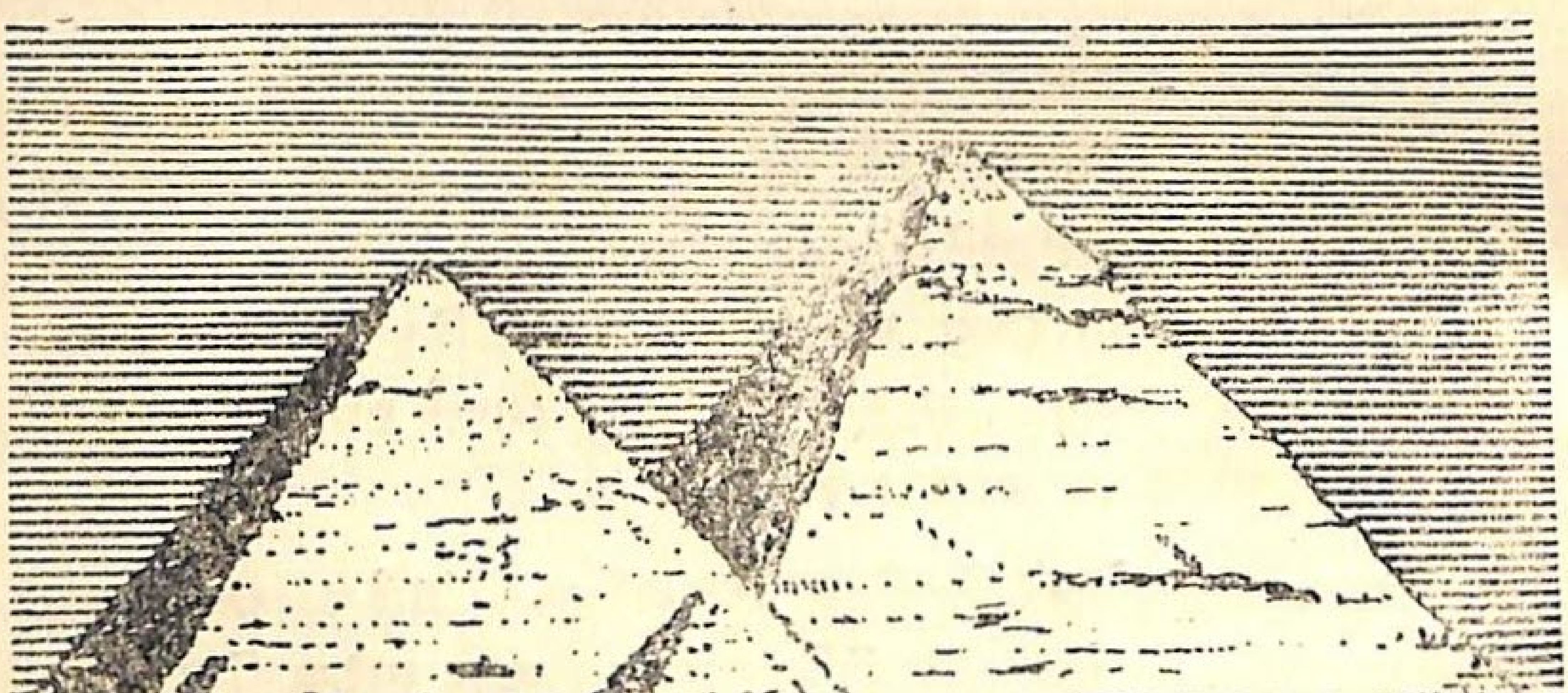
পিরামিডের দেশ

প্রাচীন মিশরে বিজ্ঞানের চর্চা প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যাতেই তারা অধিক অগ্রসর হয়েছিল। তারা লেখার লিপি আবিষ্কার করেছিল, যদিও আজকে তা প্রাচীন মিশরীয় সংকেতলিপি হিসেবেই চেনা যাবে। সে যুগে মিশরীয়রা লেখার জন্য 'প্যাপিরাস' নামক এক গাছের ছাল ব্যবহার করতো।

আর একটি বিষয়ে মিশরীয়রা বেশ এগিয়ে গিয়েছিল—সেটি হচ্ছে চিকিৎসাশাস্ত্র। যদিও এই চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে জড়িত ছিল বিভিন্ন কুসংস্কার ও নানারকম যাদুবিদ্যা; তবুও খ্রীস্টপূর্ব ১৭০০ সালের একটি দলিল থেকে জানা গেছে যে, এই সময়ে মিশরে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অর্থাৎ রোগ-নির্ণয় ও নিরাময় ব্যবস্থার ব্যাপারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হতো। মিশরীয় চিকিৎসকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা তাঁদের 'হৃদয়' অর্থাৎ হার্টের গুরুত্বের কথা জানতেন এবং পাল্‌স অথবা

শিরা সম্পর্কেও ওয়াকেফহাল ছিলেন। বিশেষ করে শল্যচিকিৎসায় তাঁরা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের বিচ্যুতি ঠিক করার ব্যাপারে এবং ছোটখাটো শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ নৈপুণ্যও প্রদর্শন করতেন। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই, মিশরীয়রা রোগকে দৈব-দুর্বিপাক অথবা অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে না করে বরং প্রাকৃতিক ঘটনা বলেই মনে করতো।

চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে মিশরীয়দের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে 'মেটেরিয়া মেডিকা' অথবা 'ওষুধের তালিকা' সংকলন। সম্ভবত চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে মিশরীয়দের সংকলিত মেটেরিয়া মেডিকাই হচ্ছে বিশ্বের প্রথম মেটেরিয়া মেডিকা। পরবর্তীকালে গ্রীকরা মিশর থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বহু কিছুই ইউরোপে নিয়ে যায়। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে মিশরীয়দের অবদানের কথা বলতে গেলে—নির্মাণ কৌশলের ক্ষেত্রে মিশরীয় অবদানকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। জগদ্বিখ্যাত পিরামিড মিশরীয় প্রযুক্তিবিদ্যার এক বিরাট সাক্ষ্য। মিশরীয়রা এ সময়ে ধাতুবিদ্যা আয়ত্ত করেছিল—নৌযান নির্মাণে তাদের দক্ষতা সর্বজনবিদিত। অন্যদিকে রসায়নশাস্ত্রেও মিশরীয়রা বেশ অগ্রগণ্য ছিলো।



মিশরের পিরামিড আর মমীর কথা আমরা সবাই জানি। এই পিরামিডগুলো ছিল প্রাচীন মিশরীয় সম্রাট, দেবী আইসিসের মন্দিরের পুরোহিত এবং রাজবংশের ও অভিজাত শ্রেণীর লোকদের সমাধি-মন্দির। শুধু উচ্চতা নয়, বরং পিরামিডের অভ্যন্তরের নির্মাণশৈলীও এতই

চমৎকার যে আধুনিক স্থপতিরাও অনেক সময় এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করেন। পিরামিডের অভ্যন্তরে মমী অথবা মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্যে রসায়নের যে জ্ঞান প্রয়োজন তার মূল্যও কিছুতেই খাটো করে দেখা যায় না। মৃতদেহগুলোতে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও মশলা এমনভাবে প্রয়োগ করা হতো যে হাজার হাজার বছর পরও এসব মমী রয়েছে অবিকৃত। আর মৃতদেহ আধার থেকে বের করলে অথবা মৃতদেহের ওপর বস্ত্রের আচ্ছাদন সরিয়ে ফেললে এই মৃতদেহ নষ্ট হয়ে যায়। অবিকৃতভবে মৃতদেহ সংরক্ষণের এই কৌশল তৎকালীন যুগে অন্য কোথাও ছিল সম্পূর্ণ অজানা। আমরা জানি, মিশরীয়রা লেখার জন্যে প্যাপিরাস নামক কাগজ ব্যবহার করতো এবং তারা কাচ নির্মাণের কলাকৌশল জানতো। সময় নির্ধারণের জন্য তারা সূর্য-ঘড়ি ব্যবহার করতো। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান অথবা আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে আমরা যা বুঝি মিশরীয়দের সে রকম কোনো সুচিন্তিত ধারণা ছিল না। অর্থাৎ এইসব ব্যবহারিক নৈপুণ্যের সঙ্গে তত্ত্বের পরিপূর্ণ সংযোগ তারা ঘটাতে পারেনি অথবা বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত রহস্য সম্পর্কেও তারা কোনো সুশৃঙ্খল নিয়ম কিংবা তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারে নি।

গ্রীস দেশের বিজ্ঞান

এদিক থেকে বরং প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার অগ্রগতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই অগ্রগতি যত না নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কারে, তার চেয়েও বেশি জ্ঞাত তত্ত্ব ও তথ্যসমূহকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করায়।

গ্রীক গণিতের পথিকৃৎ ছিলেন মিলেটাসের ‘থেলিস’। তিনি জ্যামিতির প্রাথমিক উপপাদ্যসমূহ আবিষ্কার করেন, যেমন: (১) যে কোনো বৃত্তের ব্যাস বৃত্তটিকে দ্বিখণ্ডিত করে, (২) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমিস্থ কোণ-দ্বয় পরস্পর সমান, (৩) দুটি সরলরেখা যদি পরস্পরকে ছেদ করে তাহলে বিপ্রতীপ কোণগুলো পরস্পর সমান হবে। জ্যামিতির প্রাথমিক পাঠ যারা নিয়েছে তাদের কারো কাছেই এই সূত্র তিনটি অপরিচিত নয়। কিন্তু বিখ্যাত গ্রীক গণিতবিদ পিথাগোরাসের সময় এই বিষয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয় এবং সংখ্যাসমূহ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। পিথাগোরাসের সময়ে সংখ্যা নিয়ে নানারকম

প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে জ্যামিতির বিভিন্ন সূত্র নিয়েও গণিতবিদরা কাজ করেন, যেমন, 'একটি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান' অথবা পিথাগোরাসের সেই বিখ্যাত সূত্র 'সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অন্য দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ-ক্ষেত্রের যোগফলের সমান'।

কিন্তু 'জ্যামিতি'-কে বিজ্ঞানের একটি পরিপূর্ণ বিষয়রূপে গড়ে তোলার কৃতিত্ব হচ্ছে হিপোক্রেটিস-এর।

জীববিদ্যা সম্পর্কে গ্রীকদের মধ্যে প্রথম যিনি উৎসাহ দেখান, তিনি হচ্ছেন—গ্রীক দার্শনিক অ্যানেক্সিমাইণ্ডার। তিনিই প্রাণিজগতের বিবর্তন সম্পর্কে প্রথম বলেন যে, পরিবেশজনিত কারণের ফলে টিকে থাকার ওপর নির্ভর করেই জীবজগতের বিবর্তন ঘটেছে। জীবজগতের উৎপত্তির সময় সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ ছিল জলমগ্ন। অর্থাৎ সমুদ্র ছিল সমগ্র পৃথিবীপৃষ্ঠ জুড়ে। পরে পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সামুদ্রিক প্রাণী ভূ-পৃষ্ঠের পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয় এবং স্থলচর প্রাণীরূপে বসবাস করতে থাকে। আর এই প্রাণিদের বিবর্তনের মাধ্যমেই হয়েছে অন্যান্য প্রাণীর আবির্ভাব। আধুনিক 'বিবর্তন তত্ত্বে'ও মোটামুটি এই কথা বলা হয়েছে, তবে ব্যাখ্যার দিক দিয়ে ডারউইনের তত্ত্ব আরো অধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমৃদ্ধ।

কিন্তু জীববিদ্যাকে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান হিসেবে তুলে ধরার কৃতিত্ব অবশ্য অ্যারিস্টটলের। অ্যারিস্টটল দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জীবজগৎ সম্পর্কে বহু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য উদঘাটন করেন। এমনকি সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত জীবজগৎ সম্পর্কে এর সম-কক্ষ কোনো আবিষ্কার আর ঘটেনি। কিন্তু অ্যারিস্টটল তাঁর এসব পর্যবেক্ষণে কিছু কিছু বাস্তব ব্যাপার অস্বীকার করেন। প্রাচীন বিশ্বাস ও কুসংস্কার তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি।

চিকিৎসা ও ভেষজবিদ্যায়ও গ্রীকদের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে গ্রীকদের মধ্যে পথিকৃৎ হচ্ছেন অ্যাম্পিডোক্লিস। ইনি মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রাণীদেহের বিন্দুবৎ ছিদ্রগুলির কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন। অন্য একজন গ্রীক চিকিৎসাবিদ আলেকমন শল্যবিদ্যায় বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করেন। তিনি দেহের অপটিক নার্ভ, গ্রন্থিনালী ইত্যাদি আবিষ্কার করেন এবং স্নায়ুর কেন্দ্র হিসেবে মস্তিষ্কের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু চিকিৎসা-

শাস্ত্রে গ্রীক বিজ্ঞানীদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন হিপোক্রাটিস। এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী রোগের কারণ সম্পর্কে প্রাকৃতিক কারণের নির্দেশ করেন। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক রোগেরই প্রাকৃতিক কারণ রয়েছে এবং এই কারণ ছাড়া কোনো রোগই হতে পারে না'। বস্তুত খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে এ ধরনের কথা বলা খুবই বিপজ্জনক ছিল। কারণ মানুষ তখন বিশ্বাস করতো দেবতাদের রোষ অথবা অভিশাপের কারণেই রোগব্যাধি হয়। হিপোক্রেটিস এই অন্ধবিশ্বাসকে বাতিল করে দেন।

অবশ্য গ্রীকদের এই বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে, আমরা লক্ষ্য করি, যে-সব বিষয় মানুষের ব্যবহারে আসতো প্রধানত সে সব বিষয়েই সুশৃঙ্খলভাবে কিছু তত্ত্ব ও তথ্য নির্ণয়ের চেষ্টা হয়। কিন্তু এসব ছাড়াও, বস্তুবিশ্বের গঠন ও প্রকৃতি, নক্ষত্রজগৎ এবং ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কেও জ্ঞানের চর্চা অবারিত থাকে। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস এই সময়েই 'অণু মতবাদ' প্রচার করেন। বস্তুবিশ্বের গঠন সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডেমোক্রিটিস বলেন, বস্তুজগতে কোনো অবিচ্ছিন্ন পদার্থ নেই, বরং বস্তুবিশ্বের প্রতিটি বস্তুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত এবং পৃথক পৃথক বস্তুর পৃথক পৃথক কণা রয়েছে যা আর ভাঙা অথবা বিচূর্ণ করা যায় না। তিনি এই কণার নাম দেন 'আটমোস'। গ্রীক ভাষায় 'আটমোস' শব্দের অর্থ হচ্ছে যা আর কাটা বা ভাঙা যায় না। এই 'আটমোস' শব্দ থেকেই আধুনিক 'অ্যাটম' (পরমাণু) শব্দটি এসেছে। দার্শনিক ডেমোক্রিটাস যদিও বস্তুবিশ্বের গঠন সম্পর্কে পরমাণু মতবাদ প্রচার করেন, তবুও তিনি এর সপক্ষে তেমন কোনো জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেন নি। এর অনেক পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই বিজ্ঞানীরা পরমাণু সম্পর্কে সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরেন।

আমরা বলেছি, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা এ সময় বিজ্ঞান হিসেবে বিশেষ প্রাধান্য পায়। জ্যোতির্বিদদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন অ্যারিস্টার্কাস। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে অ্যারিস্টার্কাস স্থির নক্ষত্র সম্পর্কে বলেন যে, এই নক্ষত্রসমূহ বহু দূরে অবস্থিত বলেই এদের স্থির দেখায়। তিনি বিশ্বজগতের অভাবনীয় বিরাট আকারের কথাও উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে, তিনিই প্রথম বলেন যে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে এবং সূর্যকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে।

জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে অন্য যে দু'টি বিষয় সংশ্লিষ্ট তা হচ্ছে গণিত এবং ভূগোল। গ্রীক গণিতবিদদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন ইউক্লিড। ইউক্লিডকে গ্রীক জ্যামিতির জনক বলা হয়। ইউক্লিড আসলে এই সময়কার প্রচলিত জ্যামিতির সূত্রসমূহ সংকলন ও তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। গ্রীক গণিতবিদদের মধ্যে আরেকজন বিখ্যাত ব্যক্তি হচ্ছেন হিপারকারস। তিনি তল ও ত্রিকোণমিতির ভিত্তি তৈরি করেছিলেন।

গ্রীক ভূগোলবিদদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন অ্যারাটোস্থেনিস। তিনি ছিলেন একাধারে জ্যোতির্বিদ, কবি, ভাষাবিদ ও গ্রন্থাগারিক। সূর্যঘড়ির সাহায্যে তিনি পৃথিবীর মানচিত্র তৈরি করেন এবং পৃথিবীকে বিভিন্ন অক্ষে ও দ্রাঘিমায় ভাগ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, পৃথিবীর সব মহাসাগরই হচ্ছে আসলে এক। অ্যারাটোস্থেনিসের একজন শিষ্য পৃথিবীকে পাঁচটি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করেন যা এখনো পর্যন্ত প্রচলিত। ইনিই জোয়ার-ভাটার কারণ হিসেবে চন্দ্রের অবস্থান ও আকর্ষণের কথা উল্লেখ করেন।

গ্রীক পদার্থবিদদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন আর্কিমিডাস। তিনি পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্বের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এই তত্ত্ব ছাড়াও আর্কিমিডাস গুলী, হাতল, স্ক্রু ইত্যাদি উদ্ভাবন করেন এবং আরো নানা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন।

গ্রীসে বিজ্ঞানের যে চর্চা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে গ্রীকদের নিজস্ব নয়। বিভিন্ন দেশে গ্রীক অভিযান ইত্যাদির ফলে গ্রীকরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানা দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয় এবং এই পরিচয়ের মাধ্যমেই তারা তাদের নিজস্ব বিজ্ঞান গড়ে তোলে।

উপমহাদেশের প্রাচীন বিজ্ঞান

প্রাচীন বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ভারত এবং চীনের স্থানও নগণ্য নয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও প্রাচীন চীন সভ্যতার কথা আমরা জানি। প্রাচীন ভারতে (বর্তমান বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান) গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, শল্যবিদ্যা ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি ঘটে। এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় অসুবিধা যা, তা হচ্ছে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে যা কিছু তথ্য আজকাল আবিষ্কৃত হচ্ছে তাও যথাযথভাবে প্রচারিত হয়নি। অনেকেই ধারণা করেন, আধুনিক বিজ্ঞানে যেসব তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে তার অনেক কিছু সম্পর্কেই ভারতীয় ঋষিরা মন্তব্য করেছিলেন।

কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে যে তথ্য জানা গেছে, তাতে বোঝা যায়—সে সময়কার বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাভাবনা প্রধানত দার্শনিক ধারণা ও চিন্তার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এবং তৎকালে বিজ্ঞানকে দর্শন থেকে আলাদা করে দেখার চিন্তা মোটেই ছিল না। বিশেষ করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ তেমন ছিল না বলেই সম্ভবত প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান প্রধানত তত্ত্বের সীমা ছাড়িয়ে বাস্তব প্রয়োগে যেতে পারেনি।

তবে যদ্দূর জানা যায়—খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম অথবা সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে লিপি আবিষ্কৃত হয় এবং লেখার কাগজ হিসেবে তখন ভূর্জপত্র ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। বৈদিক যুগে চিকিৎসাবিদ্যা ও ভেষজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। এ সময়ে বিভিন্ন ব্যাধি ও রোগের জন্যে পৃথক পৃথক ঔষধ আবিষ্কৃত হয় এবং ভারতীয় শল্যবিদরা বহু গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। মানবদেহ সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। প্রাচীন ভারতে চিকিৎসক এবং শল্যচিকিৎসকরা সমাজে খুবই শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

আরোগ্য ও আয়ু সম্পর্কিত বিদ্যা বলেই প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা-শাস্ত্রকে আয়ুর্বেদ বলা হতো। আদিতে আয়ুর্বেদ শ্রুতির মাধ্যমে প্রচলিত ছিল। আয়ুর্বেদজ্ঞ অগ্নিবেশ প্রথম তা লিপিবদ্ধ করেন, যা পরে চরক কর্তৃক পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে 'চরকসংহিতা' নামে পরিচিত হয়। চরকসংহিতার আটটি স্থান যথাক্রমে এক. দ্রব্যগুণ: আলোচ্য বিষয়—দ্রব্যের গুণাগুণ ও রোগের কারণ; দুই. নিদানস্থান: আলোচ্য বিষয়—রোগের লক্ষণ ও পরিচয়; তিন. বিমানস্থান: দেহ ও মনের পরিচয়; চার. শরীরস্থান: মানুষের শরীরের হৃৎপিণ্ড, ফুস-ফুস, মাংসপেশী, শিরা, হাড়, বহিরঙ্গ ও অন্তক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা; পাঁচ. ইন্দ্রিয়স্থান; ছয়. ওষুধ; সাত. চিকিৎসকের প্রতি নির্দেশ; আট. আত্মা ও আয়ু সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তা। 'চরকসংহিতা' ছাড়া আর একটি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাগ্রন্থ 'সুশ্রুতসংহিতা'র আলোচ্য বিষয় ছিল শল্যচিকিৎসা। সম্ভবত যোদ্ধাদের শরীরে বিদ্ধ শলাকা অপ-সারণ নিয়েই শল্যচিকিৎসার সূচনা। এতে শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারযোগ্য একশো রকমের অস্ত্র; হাড় ভগ্ন বা স্থানচ্যুত হলে বিশেষ রকমের বন্ধনী সহ মোট চৌদ্দ রকমের পট্টবন্ধনী বা ব্যাণ্ডেজ; চোখ, কান নাসিকা ও গলনালীতে অস্ত্রোপচার; পঙ্গু হাত ও পা কর্তন; পেট, তলপেট, বুক ও মাথায় শল্যাস্ত্র প্রয়োগ এবং কর্তিত ও বিকৃত অঙ্গাদির পুনর্গঠন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ

যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বহু আরোগ্যশালা ছিল এবং শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকরা সেখান থেকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে পারতেন। বৌদ্ধযুগে জীবক নামে একজন চিকিৎসক অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে কায়চিকিৎসক, শল্যচিকিৎসক ও শিশু-রোগ চিকিৎসক। তাঁর শিশু-চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ 'বৃদ্ধজীবকতন্ত্র' বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। 'চরকসংহিতা'ও আরবী ও ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। মিশর, আরব, ব্যাবিলন ও গ্রীসে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র প্রচারিত হয়েছিল এবং তা সেসব অঞ্চলে বিশেষভাবে সমাদৃতও হতো। তবে আদি সাফল্যের পর ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রধানত অতীত মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং এর ফলে চিকিৎসাশাস্ত্রের অগ্রগতি প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়।

জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অগ্রগতি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না এজন্য যে, এমনকি প্রাচীনতম মহাগ্রন্থ 'বেদ'-এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবী তার আপন অক্ষের ওপর আবর্তিত হয় আর এ কারণেই দিন ও রাত্রি আসে। বস্তুত সূর্য যদিও আকাশে পূর্ব থেকে পশ্চিমগামী বলে মনে হয়, আসলে কিন্তু সূর্য স্থির—'বেদ'-এ এ ধারণাটাই দেয়া হয়েছিল। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যা ক্রমে ক্রমে জ্যোতিষশাস্ত্রের দিকে পরিবর্তিত হওয়ার ফলে শুদ্ধ জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা ব্যাহত হয়।

গণিতের ক্ষেত্রে ভারতীয় গণিতবিদদের কৃতিত্ব ছিল সমধিক। তাঁরা খুব বড় বড় সংখ্যা ব্যবহার করতে পারতেন এবং সে সব সংখ্যার সাহায্যে হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করতেন। তাঁরা যে-কোনো সংখ্যার বর্গমূল ও ও ঘনমূল নির্ণয় করতে পারতেন। দশমিকের ব্যবহার ছাড়াও তাঁরা জানতেন শূন্যের ব্যবহার। বলা যায়, এই শূন্যের ব্যবহার ভারতীয়-দের কাছ থেকেই নিয়েছে অন্য আর সবাই। ভারতীয়রা জ্যামিতির ব্যাপারে গ্রীকদের সমকক্ষ ছিল না; কিন্তু বীজগণিতে ভারতীয়দের অগ্রগতি অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে $১০^{২৩}$ পর্যন্ত উল্লেখ আছে, কিন্তু গ্রীক গ্রন্থে $১০^{৪}$-এর বড় সংখ্যার উল্লেখ নেই। প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের মধ্যে আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধরাচার্য প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত আর্যভট্টই (জন্ম ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দ) প্রথম বিজ্ঞানী যিনি পৃথিবীকে সূর্য-প্রদক্ষিণরত এবং চাঁদকে পৃথিবীর চারপাশে পরি-ভ্রমণশীল বলে অনুমান করেছিলেন। এর ফলেই সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রায় সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। তিনি বৃত্তের পরিধির সঙ্গে ব্যাসের অনুপাত বা π-এর মান ৩·১৪২৮ রূপে নির্ণয়

করেছিলেন। আর্যভট্ট অনুবাদের মাধ্যমে গ্রীসদেশ ও আরবে পরিচিত ও আলোচিত হয়েছিলেন। বরাহমিহির ছিলেন ফলিত জ্যোতিষী ও গণিতজ্ঞ (মৃত্যু আনুমানিক ৫৮৭ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁর রচিত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থে গ্রহণ, পঞ্জিকা, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে অসংখ্য তথ্য রয়েছে। ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম আনুমানিক ৫৯৮ খ্রীস্টাব্দ) পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করলেও আসলে তিনিই ছিলেন বীজগণিতের স্রষ্টা এবং বীজগণিতের প্রতীকী প্রণালী তাঁর হাতেই সুনির্দিষ্ট রূপ পায়। আরবী ভাষায় অনূদিত হয়ে তাঁর বীজগণিত আরবী বীজগণিতকে সমৃদ্ধ করে এবং আরবী গ্রন্থগুলি থেকে ইউরোপে আধুনিক বীজগণিতের চর্চা শুরু হয়। শ্রীধরাচার্য (জন্ম ৯৫০ খ্রীস্টাব্দের পর) পাটিগণিতকে বীজগণিত থেকে পৃথক করেন ও সম্ভবত শূন্য বিষয়ে প্রথম বিশদ আলোচনা করেন।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা তথা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন কিংবা প্রকৌশল ও স্থাপত্যের মধ্যে প্রাচীন ভারতে প্রধানত রসায়ন ও স্থাপত্য বিদ্যায় বেশ উন্নতি ঘটেছিল। ধাতুবিদ্যা, সঙ্কর ধাতু ও ধাতু-ভস্ম প্রস্তুত, লোহা নিষ্কাশন, পাতন ও ঊর্ধ্ব-পাতন ইত্যাদির মাধ্যমে রসায়নের চর্চাও ছিল বেশ অগ্রসর। প্রাচীন ভারতীয় রসায়নবিদদের মধ্যে নাগার্জুনের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্থাপত্য শিল্পে প্রাচীন ভারত যে যথেষ্ট অগ্রসর ছিল প্রাচীন মন্দির, প্রাসাদ, মঠ ও বৌদ্ধস্তূপের কথা ভাবলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এ ধরনের নির্মাণ প্রযুক্তির জন্য কারিগরি ও যন্ত্রবিদ্যায় বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যে অপরিহার্য তা অবশ্যস্বীকার্য। আদি সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে যন্ত্রাদি নির্মাণের উপাদান, যন্ত্রনির্মাণ ও যন্ত্রবিদ্যার বিভিন্ন নির্মাণ কৌশল বর্ণিত হয়েছে। পূর্ত ও স্থাপত্যবিদ্যায় বরাহমিহিরেরও মৌলিক অবদান ছিল বলে জানা যায়।

প্রাচীন চীনের বিজ্ঞান

মিশর, গ্রীস ও প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার কথা আমরা আলোচনা করেছি। এবারে প্রাচীন চীনের বিজ্ঞানচর্চার কথা একটু বলবো। এখানে একটি কথা অবশ্যই বলে নেয়া ভালো, প্রাচীন চীনে প্রযুক্তিবিদ্যা বা টেকনোলজী যে স্তরে উঠেছিল, পৃথিবীর অন্য কোথাও তা তত উন্নতি লাভ করেনি। অথচ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বিজ্ঞান-জগতে যে বিস্ময়কর নব অভিযান শুরু হয়, চীন ছিল তা থেকে বহু দূরে। প্রবাদ বাক্য রয়েছে : জ্ঞান অন্বেষণে সুদূর

চীন যাও। অর্থাৎ প্রাচীনকালে সত্যই জ্ঞানবিজ্ঞানে চীন বিশেষ অগ্রগামী ছিল। যেমন আমরা যদিও বলি, মিশরীয়রা যে প্যাপিরাস-এ লিখতো, সেই প্যাপিরাস শব্দটি থেকেই ইংরেজী 'পেপার' বা বাংলা কাগজ শব্দটি এসেছে। কিন্তু আসলে আমরা যে কাগজ ব্যবহার করি, তার সঙ্গে চীনাদের ব্যবহৃত কাগজের সাদৃশ্যই বেশি। আমাদের কাগজ মণ্ড থেকে তৈরি এবং কাগজ তৈরির এই পদ্ধতি প্রথম চীনারাই উদ্ভাবন করে। খ্রীস্ট-পরবর্তী দ্বিতীয় শতকেই চীনারা কাগজ তৈরির এই পদ্ধতি আবিষ্কার করে। আর এ থেকেই সহজে অনুমান করা যায়—লেখার পদ্ধতিও চীনারাই আবিষ্কার করেছে বহুকাল আগেই। বস্তুত খ্রীস্ট-পূর্ব ১৪ শতকেই চীন দেশে ছবির সাহায্যে লেখার পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়।

চীনের প্রাচীন চিকিৎসা-পদ্ধতির কথা আজো সুবিদিত। মহাচীনের চিকিৎসাবিদ্যা ভারতীয় আয়ুর্বেদের ছায়ায় গড়ে উঠেছিল। এই পদ্ধতি ছিল মূলত ভেষজবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। প্রথমদিকে সহজ শল্য-চিকিৎসারও প্রচলন ছিল এবং এ সময় রোগীর চেতনানাশক হিসেবে এক ধরনের মাদকদ্রব্য ব্যবহৃত হতো। তবে কনফশিয়াসবাদে শবব্যবচ্ছেদের বিরোধিতার কারণে শল্যবিদ্যার চর্চা পরে স্তিমিত হয়ে আসে। এরপর নাড়ীপাঠ ও সূঁচের সাহায্যে করা আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতিই চীনা চিকিৎসকদের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। ভেষজকর্মে ব্যবহারের জন্য তখন ৩০০টি গাছগাছড়া ও ৩৬টি খনিজ পদার্থের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

প্রযুক্তিবিদ্যায় চীনাদের অগ্রগতি ও উদ্ভাবনের কথাও কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ২২০—২৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে চীনদেশে চক্রবাহী শকট আবিষ্কৃত হয় ও কাগজের বহুল প্রচলন শুরু হয়। অন্যদিকে গণিতে চীনারা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং ভগ্নাংশ ও বর্গমূল ইত্যাদি জানতো। জ্যামিতির ক্ষেত্রে বিন্দু, রেখার সংজ্ঞা এবং ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয়ের উপায় তাদের জানা ছিল। খ্রীস্টীয় ২য় শতকের মাঝামাঝি সময়ে চীনা গণিতজ্ঞ চৌ কুং পিথাগোরাসের উপপাদ্যের মৌলিক প্রমাণ প্রদান করেন। এছাড়া, লিউ হুই ও শুন সু ছিলেন প্রাচীন চীনের হুই প্রধান গণিতজ্ঞ। গণিত বিষয়ে রচিত গ্র াদি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ সময়ে চীনে জ্যামিতি ও বীজ-গণিত নিয়ে ব্যাপক চর্চা হয়েছে। অন্যদিকে জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চায় খ্রীস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেই চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের উল্লেখ রয়েছে এবং বিভিন্ন প্রাচীন তথ্যেও ৩৬৫$\frac{1}{8}$ দিনে বৎসর পূর্ণ হওয়ার কথা পাওয়া যায়। এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিভিন্ন গ্রহ এবং সূর্য

ও চন্দ্রের আবর্তন ও অবস্থান সম্পর্কে চীনাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা ছিল। খ্রীস্টীয় ২য় শতকের দলিলে জলকল ও ভূকম্পলিখ যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া ৭২৫ খ্রীস্টাব্দের দিকে ক্ষুদ্রাকার যন্ত্রচক্র আবিষ্কৃত হলে যান্ত্রিক ঘড়ি উদ্ভাবনের পথও উন্মুক্ত হয়। সূক্ষ্ম কারিগরি কাজে চীনাদের নৈপুণ্য ছিল বিস্ময়কর।

পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে চীনারা নিজেদের যুক্ত করতে পারেনি, যেমনটি ঘটেছে ঠিক একইভাবে গ্রীকবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। এর কারণ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের ইতিহাসকাররা বলেন, চীনের শিক্ষাপদ্ধতিই এ জন্য দায়ী। চীনারা যদিও প্রযুক্তিবিদ্যাকে তাদের বিভিন্ন কাজে প্রয়োগ করেছিল তবুও তাদের এই প্রয়োগ ঠিক বিজ্ঞান-চেতনার দিক থেকে বিচার্য নয়। সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যেই প্রাচীন চীনের শিক্ষা-পদ্ধতি সীমাবদ্ধ ছিল আর এই দুই বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল চীন সাম্রাজ্যের আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। এরা ছিল নিজেদের চিরাচরিত প্রথায় বন্দী—নতুন অথবা অভিনব কিছু চিন্তা করার ব্যাপারে তাদের কোনো প্রচেষ্টা ছিল না বললেই চলে। তবে আধুনিক চীন আজ আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছে।

আদিযুগের বিজ্ঞান

প্রাচীন বিজ্ঞান প্রসঙ্গে এটুকুই আমাদের আলোচনা। এখানে আমাদের মনে রাখা দরকার, মধ্যযুগের বিজ্ঞান শুরু হয় দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দ থেকে অর্থাৎ রোম সাম্রাজ্যের পতনের কাল থেকে। তবে এখানে আমরা যে প্রাচীন প্রযুক্তিবিদ্যার কথা বলছি সে সম্পর্কে আরো কিছু বলার প্রয়োজন রয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে আজ যেমন আমরা বুঝি আনুষ্ঠানিক যন্ত্রের উদ্ভাবন ও ব্যবহার, ঠিক তেমনই আদি প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে আমরা বোঝাই মানুষের হাতিয়ার ব্যবহার শুরু করার কাল অর্থাৎ ইতিহাসে যে যুগকে বলা হয় পুরাতন প্রস্তর যুগ। এ যুগ শেষ হয়েছে খ্রীস্টের জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। এই সময়ে জানোয়ারের হাড়, কাঠ ও চকমকি পাথরের তৈরি কুঠার, বর্শা, ছুরি, ধনুক ইত্যাদি ব্যবহার করতো সে যুগের মানুষ আর খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর পূর্বেই পৃথিবীতে শুরু হয় নব্য প্রস্তর যুগ। এযুগেও মানুষ পাথরের অস্ত্রই ব্যবহার করতো, তবে শিকার করা পশুপাখির মাংস আহারের সঙ্গে মানুষ চাষবাসও করা শুরু করে। তারা দেহে কিছু পরিধানের ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে এবং পশুর ছালের বদলে বস্ত্র ব্যবহার শুরু করে। এই নব্য প্রস্তর যুগে সুতো কাটার

ও কাপড় বোনার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। মানুষের আবিষ্কৃত যন্ত্রের মধ্যে এই দুটি যন্ত্রই হচ্ছে সবচেয়ে পুরাতন।

ব্রোঞ্জ যুগের মানুষ

খ্রীস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের দিকে মানুষ ধাতু আবিষ্কার ও তার ব্যবহার শুরু করে। এক ধরনের পাথর কয়লায় পুড়িয়ে তামা তৈরির কাজ শুরু করে তারা, আর এর সঙ্গে অল্প পরিমাণ টিন মিশিয়ে তৈরি হয় আরো শক্ত ধাতু ব্রোঞ্জ। ব্রোঞ্জযুগেই টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস উপত্যকায় গড়ে ওঠে সুমেরিয় সভ্যতা। সুমেরিয়রা নরম মাটির ফলকে ত্রিকোণাকৃতি অক্ষর ব্যবহার করে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। তারা পাটিগণিতের সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করে এবং জরীপ করার কাজের জন্য জ্যামিতির ব্যবহার শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তারা সমকোণী ত্রিভুজ ও π (পাই)-এর মান নির্ণয় করে। তারাই প্রথমে একটি বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রীতে ভাগ করে। এ থেকেই পরে সেকেণ্ড, মিনিট ইত্যাদির ধারণা গড়ে ওঠে এবং সময়ের হিসাব আবিষ্কৃত হয়। জ্যোতিবিদ্যায় সুমেরিয়দের অগ্রগতি ছিল সবচেয়ে বেশি। প্রধানত ভবিষ্যদ্বাণী করার কারণেই আকাশে নক্ষত্রের অবস্থান গণনা করতো এবং বিশেষভাবে বীজ বপন ও চাষাবাদের জন্যই তারা নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করে ঋতুর হিসাব করতো। এর সাহায্যে তারা দিনপঞ্জী আবিষ্কার করে এবং এক বছরের সময়কাল গণনা করে। এই হিসাবটা করে তারা তারকারাজির অবস্থানের সঙ্গে সূর্যের অবস্থানের তুলনামূলক বিচার থেকে। এভাবে তারা এক বছরের যে সময় নির্ধারণ করেছিল তার সঙ্গে সত্যিকারের আধুনিক হিসাবে ব্যবধান হয়েছে মাত্র সাড়ে চার মিনিট।

লৌহ যুগের কথা

ব্রোঞ্জ যুগের পর পৃথিবীতে শুরু হয় লৌহ ধাতুর ব্যবহার। এই যুগ লৌহ যুগ নামে পরিচিত। গ্রীক সভ্যতা লৌহ যুগেরই অবদান। গ্রীক সভ্যতার শুরু হয় খ্রীস্টের জন্মের প্রায় ১৪০০ বছর আগে। এই গ্রীক সভ্যতা সম্পর্কে আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি। গ্রীক সভ্যতা থেকে রোম সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত সময়কে হেলেনীয় যুগ নামেও অভিহিত করা হয়। গ্রীক বিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি ছিল প্রাচীন এথেন্স নগরী। পরে টলেমীর হাতে মিশর রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার

পর মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরী হয়ে ওঠে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থল। তবে প্রাচীন বিজ্ঞানের আলোচনায় আমরা দেখি যে, প্রথম দিকে যেমন প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার ঘটে, শেষের দিকে তেমনই এই প্রযুক্তিবিদ্যাই বিজ্ঞানচর্চা থেকে দূরে সরে যায়। গ্রীক ও রোম সাম্রাজ্যে দাস প্রথার প্রচলন ছিল ব্যাপক। এই দাসরাই যাবতীয় পরিশ্রমের কাজ করতো। ফলে তাদের প্রভুরা নিজেদেরকে এইসব দৈহিক পরিশ্রমের কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতো। দাস ছিল সহজলভ্য এবং এজন্য যন্ত্রের উদ্ভাবন বন্ধ হয়ে যায়। আর জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিজেদের জ্ঞানচর্চা, নিজেদের তত্ত্বকথা ও নিজেদের তত্ত্বীয় বিতর্কেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। এরই অনিবার্য ফল দাঁড়ায়—বিজ্ঞানবিমুখতা। অতএব যে আলেকজান্দ্রিয়া ছিল বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, সে আলেকজান্দ্রিয়া থেকেই একদিন নির্বাসিত হয় বিজ্ঞান। এইসব কারণেই রোম সাম্রাজ্যে কোনো প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে নি।

আরব সভ্যতার স্বর্ণযুগ

গ্রীক বিজ্ঞানের অগ্রগতি রুদ্ধ হওয়ার পর বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে আরবরা। কিন্তু মাঝখানে ছিল প্রায় পাঁচশো বছরের অন্ধকার যুগ। সপ্তম শতাব্দী অর্থাৎ সাতশো খ্রীস্টাব্দের দিকে আরবদের আধিপত্য বিস্তৃত হয় এশিয়া মাইনর, পারস্য, উত্তর অফ্রিকা ও স্পেনে। নবম থেকে একাদশ শতাব্দীকাল সময়ে ইসলামী সভ্যতা ছাড়িয়ে যায় পাশ্চাত্য তথা খ্রীস্টান সভ্যতাকে। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, যীশু খ্রীস্টের জন্মের প্রায় পাঁচশো বছর পরে আরবদেশে হযরত মুহম্মদ (সঃ) জন্মগ্রহণ করেন ও ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। আর ইসলাম ধর্মের প্রভাবে সমগ্র আরব-জগতে সৃষ্টি হয় এক অপূর্ব নবজাগরণ। এই নবজাগরণ শুধু ধর্মেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন চর্চাও ছিল এই নবজাগরণের প্রত্যক্ষ ফসল। হযরত মুহম্মদ (সঃ) ইন্তেকাল করেন ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে। তারপর মাত্র দশ বছরের মধ্যেই ইসলামের জয়পতাকা ছড়িয়ে পড়ে উত্তরে সিরিয়া, পশ্চিমে মিসর আর পূর্বে পারস্য পর্যন্ত। একশো বছরের মধ্যে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা পেরিয়ে স্পেন হয়ে দক্ষিণ ফ্রান্স পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায় আরবদের আধিপত্য। আর পূর্বদিকে বিস্তৃত হয় মধ্য এশিয়ার সমরখন্দ পর্যন্ত। এই বিশাল এলাকা জুড়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কেন্দ্র গড়ে ওঠায় কয়েক শতাব্দী ধরে এই অঞ্চল হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বের জ্ঞানচর্চা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল।

ইসলামের আবিভাবের অনেক আগেই গ্রীক-সভ্যতার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। গোঁড়া ও ধর্মান্ধ শাসকরা এথেন্সের বিদ্যাপীঠগুলো উঠিয়ে দিয়েছিলেন। সম্রাট জাস্টিনিয়ান ৫২৯ সালে বিখ্যাত 'প্লেটোর একাডেমী'টিও বন্ধ করে দেন। ফলে পশ্চিম ইউরোপ তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

এদিকে উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের রাজত্বকালে দামেশ্‌ক ও বাগদাদে জ্ঞানচর্চার নতুন প্রয়াস সূচিত হয়। গ্রীকদের জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব এসে পড়ে মুসলিমদের হাতে। এথেন্স থেকে বিতাড়িত একদল গ্রীক পণ্ডিত এসে উপস্থিত হয়েছিলেন পারস্যের জুন্দিশাপুর শহরে। তাঁরা গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহু বই সিরীয় ও পাহ্‌লবী ভাষায় অনুবাদ করেন। আরবরা পারস্য অধিকার করার পর এ সব বই আরবীতে অনুবাদ করার ব্যবস্থা হয়।

আব্বাসীয় বংশের দ্বিতীয় খলিফা আল-মনসুর বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন ৭৬২ সালে। আর মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাগদাদ সেকালের সবচেয়ে বড় শহরে পরিণত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দিক দিয়েও বাগদাদ হয়ে ওঠে সেকালের পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। ৭৫০ থেকে ৯০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অ্যারিস্টটল, গ্যালেন, প্লেটো, টলেমী, ইউক্লিড, আর্কিমিডিস প্রমুখ গ্রীক মনীষীদের প্রায় সব বই আরবীতে অনূদিত হয়। বিশেষত পঞ্চম আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশীদ এবং তাঁর পুত্র সপ্তম আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন গ্রীক, ভারতীয় ও অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদের কাজে অপরিসীম উৎসাহের সৃষ্টি করেন।

খলিফা হারুন-অর-রশীদ বাগদাদে একটি সরকারী হাসপাতাল স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এই হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক হয়েছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ আল-রাজি। নবম ও দশম শতকের মধ্যে মুসলিম জাহানে অন্তত ৩৪টি হাসপাতাল স্থাপিত হয়।

প্রথম যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে রসায়নবিদ আবু মুসা জাবির ইবনে-হায়ানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাবির যে সব বিষয় উদ্ভাবন করেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ সিরকার পাতন থেকে ঘন অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি; রঙিন কাচ তৈরির উন্নত পদ্ধতি; কাপড় ও লোহা সংরক্ষণের জন্য রঙ ও বার্নিসের ব্যবহার; খনিজ থেকে আর্সেনিক অ্যান্টিমনি প্রভৃতি ধাতু শোধনের পক্রিয়া।

খলিফা মামুনের সময়কালে একজন প্রতিভাবান গণিতবিদ ছিলেন মুহম্মদ ইবনে-মুসা আল-খোয়ারিজ্‌মী। তিনি ভারতীয় ও গ্রীক গণিতের শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলোর যোগ সাধন করেন এবং তারপর তাঁর নিজের

আবিষ্কার দিয়ে গণিতশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর মাধ্যমেই ভারতীয় দশমিক সংখ্যা-পদ্ধতি পাশ্চাত্যে পৌঁছায়। বীজগণিতের উদ্ভাবন তাঁর এক অক্ষয় কীর্তি। বীজগণিত তথা অ্যালজেব্রা শব্দটি এসেছে তাঁর দেওয়া নাম 'হিসাব আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা' থেকে। দশম শতাব্দীর শেষে মুসলিম জাহানের পূর্ব প্রান্তে তিনজন প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। এঁরা হলেন আল-বেরুনী (৯৭৩—১০৫০), ইবনে সীনা (৯৮০—১০৩৭) এবং ইবনুল হিসাম। আল-বেরুনী ছিলেন একাধারে চিকিৎসাবিদ, জ্যোতির্বিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, ভূগোলবিদ ও ইতিহাসবিদ। তাঁর মাধ্যমেই ভারতীয় সংখ্যারীতি এবং শূন্য ও দশমিকের ব্যবহার পাশ্চাত্যে ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়। ইবনে সীনা ছিলেন সে যুগের সবচেয়ে খ্যাতিমান চিকিৎসাবিদ। তিনি 'আল-কানুন ফিল তিব' বা চিকিৎসাবিধি নামে যে বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন তা উইলিয়াম হার্ভের সময় পর্যন্ত ছ'শো বছর ধরে ইউরোপে সবচেয়ে প্রামাণ্য চিকিৎসাগ্রন্থ হিশেবে পরিচিত ছিল। অপরদিকে ইবনুল হিসাম বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ও পরীক্ষামূলক চর্চার মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল আলোকতত্ত্ব। এ বিষয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার বর্ণনা দিয়ে তিনি 'কিতাব আল-মানাজির' বা আলোকতত্ত্ব নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

দশম শতকের শেষ দিকে মুসলিম প্রভাবে সুদূর পশ্চিমে স্পেন দেশেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। কর্ডোভা হয়ে দাঁড়ায় জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল। এছাড়া স্পেনের গ্রানাডা, সেভিল ও টলেডোতেও জ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এই সাথে গ্রীক ও আরব বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থ আরবী থেকে ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনূদিত হতে থাকে।

এদিকে দশম শতকের পর থেকেই মুসলিম জাহানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হ্রাস পেতে শুরু করে। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে ছোট ছোট রাজ্যে পরিণত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই মুক্তবুদ্ধির চর্চা, স্বাধীন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং সাধারণভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় ভাটা পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দীর পর মুসলমানদের বিজ্ঞান-চর্চায় সূচনা হয় বন্ধ্যাত্বের। এদিকে ইউরোপের অন্ধকার যুগ কেটে গিয়ে শুরু হয় নবজাগরণ বা রেনেসাঁ।

আরব থেকে ইউরোপ

বস্তুত আরবদের বিজ্ঞানচর্চাই আবার ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। স্পেন এবং সিসিলীর মাধ্যমে তা আবার ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপে। গ্রীকদের যে সব গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল সেসব বই আবার সেই আরবী থেকেই অনূদিত হয় ল্যাটিন ভাষায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে শুরু হয় গ্রীক বিজ্ঞানের এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পালা। কিন্তু এবারে আর গ্রীকদেশে নয়, বিজ্ঞানের এই চেতনা ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপে আর এভাবেই মধ্যযুগের শেষ দিকে শুরু হয় ইউরোপে নতুন বিজ্ঞানের যুগান্তকারী চর্চা। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপ আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ইসলাম ধর্ম তারা গ্রহণ করেনি। অনুরূপভাবে এই আধুনিক যুগেই আবার পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণ করেছে প্রাচ্য, কিন্তু সে অনুপাতে পাশ্চাত্যের ধর্ম ও দর্শনের প্রতি প্রাচ্যের আগ্রহ কম।

অন্ধকারের ইউরোপ

ইউরোপে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর শুরু হয় এক অন্ধকার যুগ—একথা আমরা পূর্বেও বলেছি। এই সময়ে সারা ইউরোপ ভূখণ্ড জুড়ে চলে যুদ্ধবিগ্রহ, ছিল অপরিসীম রাজনৈতিক অস্থিরতা। পাঁচশো বছর ধরে চলে এই দুঃসময়। তারপর ধীরে ধীরে আবার জীবনযাত্রা মোটামুটি নির্বিঘ্ন হয়ে আসে। শুরু হয় অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য। চাষবাসের কাজে এবারে ঘোড়া ব্যবহৃত হতে থাকে, আবিষ্কৃত হয় নতুন ধরনের লাঙল।

অন্ধকার যুগে গীর্জা এবং গীর্জাকেন্দ্রিক স্কুলগুলোই ছিল তখনকার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। আর স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত গীর্জা অথবা গীর্জাকেন্দ্রিক স্কুলসমূহকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞান অথবা প্রযুক্তিবিদ্যা প্রসার লাভ করতে পারেনি, বরং ধর্মীয় কুসংস্কারই এখানে প্রধান হয়ে ওঠে। প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধানে চিন্তা অথবা যুক্তি ব্যবহারের পরিবর্তে একালের মানুষ মনে করতো সব কিছুই ঘটে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবং সমস্ত কিছুই আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। আর মানুষের জ্ঞান? হাঁ—তাওতো লেখা আছে ঐই পুঁথিগুলোয়। এর বাইরে চিন্তা করার প্রয়োজনটাই বা কি। অর্থাৎ নতুন চিন্তার কোনো স্থান নেই, নতুন করে জানার কোনো তাগিদও নেই।

বিজ্ঞানের ইতিহাসের এই যে অন্ধকার যুগ, এর বহু কারণ বিশ্লেষণ করেছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলেন, কোনো জাতি অথবা দেশের অগ্রগতি নির্ভর করে সেই দেশ বা জাতির সে সময়কার সমাজব্যবস্থার ওপর। সমাজব্যবস্থা বলতে আমরা কি বুঝি? সমাজব্যবস্থা বলতে সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, মানুষের চিন্তাভাবনা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতি বোঝায়। যেমন প্রাচীনকালে যখন কৃষি পদ্ধতির আবিষ্কার হয়নি, মানুষ যখন জন্তু-জানোয়ার শিকার করে জীবন নির্বাহ করতো তার সঙ্গে কৃষিভিত্তিক সমাজের কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মোটামুটি সহজভাবে বলতে গেলে আমরা বুঝি—মানব সমাজের উৎপাদন প্রক্রিয়া সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্ধকার যুগে এই সমাজব্যবস্থাই মূলত বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারের পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় ছিল পুরোহিততন্ত্রের রাজত্ব অর্থাৎ ধর্মের ধ্বজাধারী পুরোহিতরাই ছিলেন সমাজের হর্তাকর্তাবিধাতা এবং তাঁরা এমনকি রাজশক্তির চেয়েও অধিক প্রভাবশালী ছিলেন। মধ্যযুগের এই বাধা উত্তীর্ণ হওয়ার পেছনে যে বিশেষ কারণটি কাজ করেছে তা হচ্ছে সমাজের প্রয়োজনে নতুন করে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার। এখানে আমাদের আবার স্মরণ করা দরকার যে, প্রযুক্তিবিদ্যা সত্যিকারের বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নয়। তবে মধ্যযুগের শেষদিকে ইউরোপে প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন নতুন উদ্ভাবন আবার বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। এই সময়ে ব্যাপকভাবে পানি-কলের প্রচলন শুরু হয়। পানি-কল হচ্ছে পানির স্রোতের সাহায্যে চালানো যায় এমন একটি যন্ত্র। এইসব কলের সাহায্যে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন হতো। আর এভাবেই এই পানি-কল ব্যবহৃত হতে লাগলো বিভিন্ন কাজে, যেমন করাত কল, খনির ভেতর পাম্প করার কাজ, পাথর ভাঙা, লোহার পাত রোল করা, তার টানার কাজ ইত্যাদিতে। আর এভাবেই এ ধরনের কাজের জন্য নতুন একটি শ্রেণীর জন্ম হয়। এই সময়েই বারুদ, কাচ, কাগজ প্রভৃতির ব্যবহার চালু হয় এবং হাওয়া-কল নির্মিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই নিরীক্ষাধর্মী বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে। রোজার বেকন (১২১৪-৮৪) পরকলা (LENSE) এবং বারুদ নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তিনি বলেন, দুই উপায়ে বিজ্ঞানের চর্চা করা যায়। এক. যুক্তির সাহায্যে এবং দুই. পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। যেখানে যুক্তি শেষ হয় সেখানে হাতে-কলমে

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এগুনো যেতে পারে। কিন্তু তৎকালীন সমাজ তাঁকে রেহাই দেয়নি। চৌষট্টি বছর বয়সে তিনি সন্দেহজনক কর্ম-তৎপরতার কারণে অভিযুক্ত হন।

এই হচ্ছে মধ্যযুগের জ্ঞানচর্চার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। বিজ্ঞানের ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায় শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অর্থাৎ ১৪০০ সালের পর থেকে—খ্রীস্টের জন্মের চৌদ্দ শ' বছর পর। এই শতাব্দীতে শুরু হয় বিজ্ঞানের ইতিহাসের নতুন অধ্যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের শুরুর কালও এই পঞ্চদশ শতাব্দী। তত্ত্বজ্ঞানের কঠিন নিগড় থেকে মুক্তি পেলো বিজ্ঞান।

ইতিহাসবিদগণ এই সময়কালকে ইউরোপের রেনেসাঁ বা নবজাগরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসেও এই রেনেসাঁর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার আর অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে মানব-জাতির নতুন যুদ্ধ হলো শুরু। সে যুদ্ধ আজও শেষ হয় নি। বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আমরা পরিচিত হবো মানব-জাতির এই অসাধারণ যুদ্ধের সাথে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞানের জন্মদিন

আজ থেকে প্রায় দু'হাজার ছ'শো বছর আগের কথা। অর্থাৎ সময়টা তখন খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৫ সাল। বর্তমানে যেখানে তুরস্ক তারই পশ্চিম প্রান্তের এক শহর—নাম মিলেটাস। মিলেটাস তখন তুর্কীদের নয়, গ্রীকদের শহর। ব্যবসা-বাণিজ্য আর সমৃদ্ধির কারণে এই মিলেটাস শহরের তখন বেজায় নামডাক।

সে বছর এই শহরটায় ঘটলো এক অদ্ভুত ঘটনা। থ্যালিস নামে এক বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত ঘোষণা করেছেন, আঠাশে মে তারিখে এই শহর থেকে দেখা যাবে সূর্যগ্রহণ। হ্যাঁ, সূর্য ঢাকা পড়ে যাবে, রোদের তেজ আর সূর্যের মুখ ঢাকা পড়ে যাবে, মধ্যবর্তী চাঁদের কারণে। এমন ঘটনা এর আগে আর কখনো ঘটেনি। থ্যালিস তাঁর জ্যোতি-বিদ্যার গণনা থেকে নির্ভুল তারিখটি আগেভাগেই বলে দিয়েছেন। আর বলে দিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকেননি। সূর্যগ্রহণের কারণটাও বর্ণনা করেছেন তিনি। তিনি বলেছেন, আকাশের চাঁদটা যখন সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ে তখন পৃথিবীর কোন কোন জায়গা থেকে সূর্যকে আর দেখা যায় না। এরই নাম সূর্যগ্রহণ। থ্যালিসের এই ঘোষণার আগে লোকজন বিশ্বাস করতো—সূর্যগ্রহণ এক অলৌকিক ঘটনা, অপদেবতারা সূর্যকে গ্রাস করে—এ বুঝি এক অমঙ্গলের চিহ্ন।

থ্যালিস বললেন, না এ নেহাৎই লৌকিক ঘটনা। এর মধ্যে দেবতা-দেবতাদের কেনোরকম বাহাদুরী নেই।

থ্যালিসের কথামতো ঠিকই আটাশে মে তারিখে সূর্যগ্রহণ ঘটলো। মিলেটাসবাসীরা অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলো এই সূর্যগ্রহণ।

সত্যি। থ্যালিসই প্রথম প্রকৃতির এইসব ঘটনাকে বিচারবুদ্ধি আর বাস্তবতা দিয়ে বিবেচনা করলেন। বিজ্ঞানের হলো জন্ম। থ্যালিস সেই জন্মেরই ঘোষণা দিলেন বুঝি!

থ্যালিসের এই ঘটনার পর বহুকাল গত হয়েছে। শুরু হয়েছে মধ্যযুগের ইউরোপের তমসাচ্ছন্ন কাল। এখন আবার সেই গীর্জার পুরোহিতরাই প্রধান হয়ে উঠেছে। বিচারবুদ্ধি আর বিজ্ঞানকে তারা দিয়েছে নির্বাসন। এই সময়েই পোল্যাণ্ডে জন্ম হয়েছিল প্রতিভাবান এক বিজ্ঞানীর। নাম তাঁর নিকোলাস কপার্নিকাস। ১৪৭৩ সালে ভিশ্চুলা নগরীর বন্দর এলাকা থর্ণ-এ তাঁর জন্ম হয়। এর আগে ১৪২০ সালের দিকে পর্তু-গালের যুবরাজ হেনরী সেণ্ট ভিনসেণ্ট অন্তরীপে একটি মানমন্দীর স্থাপন করেছিলেন। এই সঙ্গে এখানে স্থাপিত হয়েছিল নৌ-চালনা গবেষণা কেন্দ্র।



ক্র্যাকোতে তখন ছিল জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার এক স্কুল। ক্র্যাকোর এই স্কুলেই কপার্নিকাস তাঁর স্নাতক পর্যায়ের লেখাপড়া শুরু করেন। ক্র্যাকো-তে চার বছর অধ্যয়নের পর তিনি যান বোলোগনায়। সেখানে গণীত শাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যা ছাড়া তিনি আইনশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। আর একই সঙ্গে তিনি শিক্ষা করেন গ্রীক ভাষা। গ্রীক ভাষা শেখার পর কপার্নিকাস মূল ভাষাতেই গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থসমূহ পাঠ করার সুযোগ লাভ করেন। এখানে পাঠ শেষ করে কপার্নিকাস এবার চলে যান ইতালীর পদুয়ায়। পদুয়া তখন ইউরোপের নতুন রেনেসাঁর পীঠস্থান। পদুয়ায় কপার্নিকাস ভেষজবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। আর এই অধ্যয়নের জন্য ইতালীতে তিনি অতিবাহিত করেন সুদীর্ঘ দশটি বছর।

অধ্যয়নের পালা শেষ করার পর কপার্নিকাস তাঁর কাকা এরমল্যাণ্ডের বিশপের সহায়তায় ফ্রাউয়েনবুর্গ গীর্জার যাজকের পদ লাভ করেন। এখানেই তিনি অতিবাহিত করেন তাঁর জীবনের শেষ তিরিশটি বছর। ফ্রাউয়েনবুর্গ গীর্জাটি ছিল বাল্টিক সাগরের কাছে ছোট একটি পাহাড়ের উপর। এর কাছাকাছি একটি গম্বুজের ওপর থেকেই কপার্নিকাস নক্ষত্র ও গ্রহসমূহ পর্যবেক্ষণ করতেন। এভাবেই তিনি তাঁর এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সূর্য, পৃথিবী ও গ্রহসমূহের অবস্থান ও গতি সম্পর্কে নতুন এক ধারণা দিলেন। তাঁর এই তত্ত্ব কপার্নিকাস তত্ত্ব নামে পরিচিত। সৌরজগৎ সম্পর্কে কপার্নিকাস একটি বই লিখেছিলেন ধীরে ধীরে। এই বইটির নাম 'নভোবস্তুসমূহের পরিভ্রমণ সম্বন্ধে।'

কপার্নিকাস এই লেখা শেষ করেছিলেন ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু বইটি প্রকাশিত হয় ১৫৪৩ সালে অর্থাৎ কপার্নিকাস যখন মৃত্যুশয্যায় তখন বইটির এক কপি তাঁর হাতে পোঁছলো। তখনো অবশ্য বইটি সাধারণের জন্য প্রকাশিত হয়নি।

শিল্পী-বিজ্ঞানী দ্য ভিঞ্চি

কপার্নিকাসের জন্মের আগে থেকেই বস্তুত ইউরোপে নবজাগরণের পালা শুরু হয়েছিল। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস সূচিত হয়। এই সময়ে ইসলামী বিজ্ঞান ও গ্রীক বিজ্ঞানের ঐতিহ্য সম্বল করে ইউরোপবাসীরা নতুন কারিগরি জ্ঞানের সন্ধান করতে শুরু করে। সারা ইউরোপ জুড়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার চেষ্টাও চলতে থাকে অব্যাহত গতিতে। এর ফলেই ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস ও বলোগ্না, ১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড, ১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে কেমব্রিজ ও ১২২২ খ্রীষ্টাব্দে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সব কটিতেই শিক্ষার মাধ্যম ছিল ল্যাটিন ভাষা। কিন্তু এসময়কার শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার বেশির ভাগই ছিল নেহাৎ কেতাবী অর্থাৎ তত্ত্বের কচকচি। বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সত্যতা নিরূপণের ব্যাপারে তখনও তেমন আগ্রহ সৃষ্টি হয় নি। তবুও এ সময়ে যাঁরা প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাইরে গিয়ে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার মধ্যেই বিজ্ঞানকে সীমিত রাখায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে গণিতজ্ঞ স্যাভাসর্ডা (জন্ম আনুমানিক ১১০০ খ্রীঃ), আডেলার্ড (জন্ম ১১৭০ খ্রীঃ), ও জর্দানাস-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ১২৬৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে মারিকোর্ট চুম্বকত্ব বিষয়ে তাঁর

অসাধারণ গবেষণাকে ভিত্তি করে একটি বই লেখেন। এ বইটি বহু-কাল ধরে চুম্বকত্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ রচনা বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

'মোনালিসা-'র অমর শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ছিলেন মধ্যযুগ ও রেনেসাঁর মধ্যবর্তী সময়ের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। প্রকৃতির নিয়-মের ধারাবাহিকতা আবিষ্কারের জন্য তাঁর নিরন্তর পর্যবেক্ষণ এবং শরীরসংস্থান ও গতিবিদ্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ সচিত্র বর্ণনা যেমন তাঁর পাণ্ডু-লিপিতে পাওয়া যায়, তেমনি সেখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র, যন্ত্রযান ও ইঞ্জিনিয়ারিং মডেল সম্পর্কে নিপুণ ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা। জোতির্বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যে গভীর-ভাবে চিন্তাভাবনা করেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর হাজার হাজার পাতার পাণ্ডুলিপিতে। লিওনার্দোর এই রচনার সর্বত্রই রয়েছে বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যার গাণিতিক বিবরণ।

ইতালীর ফ্লোরেন্স শহরের খুব কাছে ভিঞ্চি নামে একটি গ্রামে লিওনার্দোর জন্ম, ১৪৫২ সালে। তাঁর পিতা পিয়ারো দ্য-ভিঞ্চি ছিলেন একজন আইনজীবী। শৈশব থেকেই লিওনার্দো ছিলেন অশান্ত ও দুরন্ত। গ্রামের স্কুলেই তাঁর পড়াশোনা শুরু হয়। কিন্তু লেখাপড়ার চেয়ে প্রকৃতির বৈচিত্র্য এবং রঙ ও রূপেই ছিল তাঁর অধিক আগ্রহ। লিওনার্দোর ছিল অসাধারণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছবি আঁকতেন। ফ্লোরেন্সে তখনকার খ্যাতিমান শিল্পী ভোরেসিওর ষ্টুডিওতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি অল্পবয়সেই। এখানে তিনি বারো বছর কাজ করেন। এ সময় তিনি চিত্রাঙ্কন ছাড়াও চিকিৎসাবিদ্যা, খনিজতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ও যন্ত্র-প্রকৌশল ইত্যাদিরও চর্চা করেন। ছবি আঁকার সাথে সাথে তিনি নানাধরনের যন্ত্রের নক্শা এঁকেছিলেন অত্যন্ত যত্নের সাথে। এগুলোর মধ্যে প্রপেলার চালিত উড়োজাহাজের নকশা এবং ড্রেজার তৈরির কলাকৌশলও ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর এই কালগত নক্শা অঙ্কনের বহু পরে এসব যন্ত্রযান আবিষ্কৃত হয়। তিনি খুব হালকা ও বহনযোগ্য সেতু তৈরির কৌশলও উদ্ভাবন করেছিলেন।

তবে বিজ্ঞানী হিসেবে লিওনার্দোর পরিচয় নিতান্ত গৌণ। এ যুগের মানুষ তাঁকে চেনে 'মোনালিসা', 'লাস্ট সাপার' এবং 'ম্যাডোনা অ্যাণ্ড চাইল্ড' ইত্যাদি মহৎ চিত্রকর্মের অসাধারণ শিল্পী হিসেবে।

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মহৎ শিল্পী, উদ্ভাবক ও বিজ্ঞানী পরলোক গমন করেন।

কপার্নিকাসের আগে পর্যন্ত পণ্ডিতমহলের মত ছিল, পৃথিবীই হচ্ছে সৌরজগতের কেন্দ্র। অর্থাৎ সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী ঘুরছে না, বরং পৃথিবীকে ঘিরেই ঘুরছে সূর্য। পাদ্রী আর পুরোহিতরাও বলতেন—এইটাই সত্য। এমনকি যে গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টটলকে আমরা অনেক বড় পণ্ডিত বলে মনে করি তিনিও বলেছিলেন, পৃথিবী অনড়, স্থির। এর চারদিকে পঞ্চান্নটি স্বচ্ছ গোলক ঘুরছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে। এই গোলকগুলোর মধ্যেই রয়েছে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি স্বর্গীয় বস্তু। তিনি বলেন, পৃথিবী চারটি মৌলিক উপাদানে নির্মিত। এগুলো হচ্ছে মাটি, বায়ু, আগুন এবং পানি। পৃথিবীর বাইরে চন্দ্র প্রভৃতি পঞ্চম একটি উপাদানে নির্মিত এবং এই পঞ্চ উপাদানের কোনো ক্ষয় নেই। কপার্নিকাস কিন্তু এই মত মেনে নিতে পারলেন না। অনেক হিসাব করে ও দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ চালিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন—এতকাল পর্যন্ত প্রচলিত এই মতটি একেবারে ভুল। তিনি বললেন, আসলে সূর্যই হচ্ছে সৌরজগতের কেন্দ্র। পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারিদিকে, সূর্যকেই কেন্দ্র করে। তিনি আরো বললেন, পৃথিবীর ছুটো গতি রয়েছে। একটি হচ্ছে তার আহ্নিক গতি অর্থাৎ পৃথিবী তার আপন অক্ষে ঘুরছে আর অন্যটি হচ্ছে, অন্যান্য গ্রহের মতো পৃথিবীও তার নিজস্ব কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এই গতি হচ্ছে বার্ষিক গতি।

কপার্নিকাস অবশ্য শুধু পৃথিবীর এই গতি সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সূর্য, পৃথিবী এবং চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের বিভিন্ন অবস্থান হিসাব করে একটি তালিকাও তৈরি করেছিলেন। এইসব হিসাব-নিকাশ শেষ করতে তাঁর বহু বছর লেগেছিল। অবশ্য কপার্নিকাসের বহু আগে মিশরীয় জ্যোতির্বিদ টলেমিও এ ধরনের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। আমরা আগেই বলেছি—কপার্নিকাস মৃত্যুশয্যায় তাঁর বইটি মুদ্রিত অবস্থায় দেখেছিলেন। কিন্তু যদি বেঁচে থাকতেন—তাহলে কি হতো? কি হতো তা বলা যায় না। কিন্তু তিনি যে সেই ধর্মান্ধ পাদ্রীদের রোষানলে পড়তেন সে বিষয়ে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নেই। কেননা, তাঁর মৃত্যুর পর পাদ্রীরা তাঁকে পাষণ্ড আখ্যা দিলেন আর কপার্নিকাস-এর বইটিকে রোমান ক্যাথলিক গীর্জার প্রভুরা প্রায় ছুশো বছর ধরে নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকাভুক্ত করে রেখেছিলেন। সে যাই হোক—কপার্নিকাসের এই সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের তত্ত্বটিকে আরো খানিকটা পরিবর্তন করে আধুনিক

জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপযোগী করেছিলেন যে দু'জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী তাঁরা হচ্ছেন গ্যালিলিও গ্যালিলাই এবং জোহান কেপলার।

গ্যালিলিও গ্যালিলাই

গ্যালিলিওর জন্ম হয় ইতালীতে, ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ কপার্নিকাসের মৃত্যুর প্রায় ২১ বছর পর। গ্যালিলিও ছিলেন একজন গণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে দূরবীন আবিষ্কারের পরই তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক যুগান্তর ঘটাতে সক্ষম হন। এই সময় তিনি শুনতে পান যে ফ্ল্যাণ্ডার্স-এর এক ব্যক্তি নাউস-এর কাউন্ট



মরিসকে এমন একটা যন্ত্র তৈরি করে উপহার দিয়েছেন যেটা দিয়ে দূরের জিনিসকে কাছে দেখা যায়। আর এই যন্ত্রটিতে ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র দুটি লেন্স। খবরটি শোনামাত্রই কাজে লেগে গেলেন তিনি। অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়ে গেল তাঁর নিজস্ব দূরবিন। আর অনতিবিলম্বেই ভেনিসের সিনেটরদের তিনি দেখিয়ে দিলেন তাঁর এই নতুন যন্ত্রের কার্যকারিতা। ভেনিসের সর্বোচ্চ বেল টাওয়ারে দাঁড়িয়ে তাঁরা দূরবীনের সাহায্যে দেখলেন দূরসমুদ্রের জাহাজগুলো। গ্যালিলিও তখন ছিলেন পত্নয়ায় গণিতের অধ্যাপক। দূরবীনের আবিষ্কারককে সাথে সাথেই বেতন দ্বিগুণ করে দিয়ে স্বীকৃতি দেওয়া হলো।

এবারে রাতের আকাশের দিকে দূরবিনের দৃষ্টি ফেরালেন গ্যালিলিও। দূর-আকাশের তারকারাজির চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠলো তাঁর চোখে। খালি চোখে দেখা যায় না যে সব তারা, সেগুলো এবার দেখতে পেলেন তিনি। ছায়াপথের পরিচয়ও স্পষ্ট হয়ে উঠলো তাঁর চোখে।

ছায়াপথ আর কিছুই নয়—অসংখ্য তারকার একত্র সমাবেশ মাত্র। তিনি দেখলেন, চাঁদের শরীর তেমন মসৃণ নয়—যেমনটি আমরা সবাই খালি চোখে দেখি। বরং চাঁদের গা অনেকটা আমাদের এই পৃথিবীরই মতো। সূর্যের গায়ের কালো দাগগুলোও স্পষ্ট ধরা পড়লো তাঁর চোখে আর দেখলেন বৃহস্পতির রয়েছে চারটি উপগ্রহ, যেমন আমাদের পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ, চাঁদ। তিনি বৃহস্পতির এই চারটি উপগ্রহের নাম দিলেন 'ম্যাডিসীয় তারকা', তাঁর পৃষ্ঠপোষকের নামানুসারে।

খুব শীগগীরই গ্যালিলিও-র এই দূরবীনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো সারা ইউরোপে। রাজা-রাজড়ারা তাঁকে অনুরোধ করে পাঠাতে লাগলেন তাঁদেরকেও অমন একটি দূরবীন বানিয়ে দেওয়ার জন্যে। ফ্রান্সের রাজসভায় এমনই একটি দূরবীন পৌঁছলে সেখানে দারুণ সাড়া পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের পক্ষ থেকে গ্যালিলিওকে চিঠি দেওয়া হয়, 'প্রার্থনা করি তাড়াতাড়ি যেন আপনি একটি নক্ষত্র আবিষ্কার করতে পারেন আর সেই আবিষ্কৃত স্বর্গীয় বস্তুর নামের সঙ্গে মহামান্য সম্রাটের নাম জড়িয়ে ফরাসী সম্রাটের নাম চিরস্মরণীয় করে রাখুন'। গ্যালিলিওর এই আবিষ্কার কপার্নিকাসের ধারণাকেই সমর্থন করে। ফলে অ্যারিস্টটল-এর অনুসারীরা এবং গীর্জার পুরোহিতরা তাঁর ওপর খড়গহস্ত হয়ে ওঠে। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'লেটারস অন দি সোলার স্পটস' বইটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি কপার্নিকাসের সৌরতত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। তাই দেখে ক্ষেপে উঠলো গীর্জার পুরোহিতের দল। শুরু হলো তাঁর ওপর নির্যাতনের পালা।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিও প্রকাশ করেন তাঁর বই 'ডায়লগ কনসার্নিং দ্য টু চীফ ওয়ার্ল্ড সিস্টেমস্—টলেমিক এণ্ড কপার্নিকান'। এই বইতে তিনি অ্যারিস্টটলের অনুসারীদের ওপর তীব্র আক্রমণ করলেন। এবারে নেমে এলো চরম নির্যাতন। পোপের সমন পৌঁছল তাঁর কাছে। তাঁকে যেতে হবে ইতালীর রোম নগরে। পোপের ঘাঁটিও সেখানেই। তাঁর আদালতে ইনকুইজিসন হবে তাঁর। গ্যালিলিওর বয়স তখন ৬৮ বছর। শরীর ভেঙে পড়েছে। অতদূরের পথ যাবেন কি করে তিনি? কিন্তু না, পাণ্ডা পুরোহিতের দল রেহাই দিলো না তাঁকে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'আবিষ্কারের অভিযান' বইটিতে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন: 'বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওকে বন্দী করে আনা হলো রোম নগরে, দাঁড় করানো হলো

আসামীর কাঠগড়ায়। কিন্তু অপমান আর লাঞ্ছনার শেষ ওখানেই নয়। তাঁকে নাকি জোর করে হাঁটু গেড়ে বসানো হলো, তাঁকে নাকি জুলুমের চোটে বলতে বাধ্য করা হলো যে ওই রকমের একটি বই লিখে তিনি অন্যায় করেছেন।

'কিন্তু সত্যিই অন্যায় নাকি? নিজের হাতে দুরবীন বানিয়ে নিজের চোখে তিনি যা দেখেছেন সেই কথাই তো লিখেছেন বইতে। জুলুম অবশ্য বড়ো ভয়ানক—জুলুমের চোটে তিনি যা বলতে বাধ্য হলেন তা নিশ্চয়ই তাঁর মনের বিশ্বাস নয়। তাই উঠে দাঁড়াবার পর গ্যালিলিও নাকি অধৈর্য হয়ে মাটিতে পা ঠুকে চিৎকার করে উঠেছিলেন: কিন্তু তবুও, সত্যিই যে পৃথিবী সূর্যকে ঘিরেই ঘুরছে।

'তাঁর এই দুঃসাহসের জন্যে বিচারকেরা তাঁকে ক্ষমা করেনি। ফলে বাকি জীবনটা গ্যালিলিওকে কাটাতে হয় বন্দী হয়েই।'

টাইকো ব্রাহে

কপার্নিকাস আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক। গ্যালিলিও তাঁরই সুযোগ্য বিপ্লবী উত্তরসূরি। আর এঁদের সঙ্গেই যে আরেকটি নাম জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়, তিনি জোহান কেপলার। কিন্তু কেপলারের আগে অন্য এক জ্যোতি-বিজ্ঞনীর কথা উল্লেখ করতে হয়। তিনি টাইকো ব্রাহে। ব্রাহে



ছিলেন অ্যারিস্টটলের মতোই, পৃথিবী অনড় ও স্থির, এই মতের অনু-সারী। তাঁর তত্ত্ব ছিল, পৃথিবী স্থির—অন্য গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র

করে ঘুরছে এবং সূর্য আবার এইসব গ্রহ-উপগ্রহ সহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। তাঁর ধারণা ছিল, পৃথিবীর মতো ভারী কোনো বস্তুর পক্ষে বৃত্তাকার পথে ঘুরে আসা সম্ভব নয়। টাইকো ব্রাহে কপার্নিকাসের তত্ত্বের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ পরবর্তীকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজে প্রভূত সহায়তা করেছে। টাইকো ব্রাহের জন্ম ১৫৪৬ সালে। ১৫৭১ সালের ১১ই নভেম্বর নতুন একটি নক্ষত্রের আবির্ভাবের সংবাদে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ডেনমার্কের রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সাহায্যে তিনি ভীন নামক একটি দ্বীপে তাঁর মানমন্দির গড়ে তোলেন। বিশ বছর ধরে তিনি রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করেন এবং গ্রহ ও নক্ষত্ররাজির অবস্থান ও গতিপথ নির্ধারণ করেন।

কিন্তু টাইকো ব্রাহে তাঁর উগ্র ব্যবহারের কারণে অনেককে শত্রু করে তোলেন এবং ১৫৯৭ সালে রাজা ফ্রেডারিকের মৃত্যুর ন'বছর পর তিনি তাঁর এই মানমন্দির ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এরপরে বোহেমিয়ার সম্রাট তাঁকে প্রাগের কাছে একটি দুর্গ প্রদান করেন। এখানেই জোহান কেপলার তাঁর সহকারী হিসেবে যোগদান করেন। আর টাইকো ব্রাহের মৃত্যুর পর ১৬০১ তাঁর পর্যবেক্ষণের সব তালিকা ও ফলাফল জোহন কেপলারের হাতে এসে যায়।

জোহান কেপলার

জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহান কেপলারের জন্ম ১৫৭১ সালে। কেপলারের পিতা ছিলেন ফুটেমবুর্গের সামরিক অফিসার, মা সরাইখানার মালিকের কন্যা। তিনি মূলত ছিলেন একজন গণিতজ্ঞ এবং টুবিহোন-এ পড়ার সময় তিনি সেখানকার জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক মাইকেল মাস্তলিনের প্রভাবে কপার্নিকাস তত্ত্বের অনুসারী হয়ে পড়েন। এরপর তিনি টাইকো ব্রাহের সহকারী হিসেবে কাজ করেন এবং ব্রাহের মৃত্যুর পরও তিনি প্রাগে অবস্থান করে গ্রহসমূহের গতিপথ সম্পর্কে তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যান।

কপার্নিকাস তাঁর সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের তত্ত্বে গ্রহসমূহের গতিপথকে বৃত্ত হিসেবে ধরেছিলেন, কিন্তু কেপলার দেখলেন এতে গণনায় কিছু গোলমাল থেকে যায় এবং গ্রহাদির বিভিন্ন সময়ের বাস্তব অবস্থানের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কেপলার গ্রহসমূহের গতিপথের ব্যাখা দিয়ে বলেন, এই গতিপথ বৃত্তাকার নয়, অথবা গ্রহগুলি

সমগতিসম্পন্নও নয়। ১৬১০ সালে কেপলার গ্রহসমূহের গতি সম্পর্কে দুটি সূত্র নির্দেশ করেন। এগুলোকে কেপলারের সূত্র নামে অভিহিত করা হয়। ন'বছর পর কেপলার গ্রহদের গতি সম্পর্কে তাঁর তৃতীয় সূত্রটি আবিষ্কার করেন। কেপলার তাঁর এই প্রসিদ্ধ তিনটি সূত্রে বলেন, বিভিন্ন গ্রহের গতিপথ বৃত্তাকার নয়, উপবৃত্তাকার ; নিজ নিজ কক্ষপথে গতিশীল গ্রহগুলির বেগ অসম ; এবং সূর্যের চারপাশে একবার সম্পূর্ণ আবর্তিত হয়ে আসতে একটি গ্রহের যে সময় লাগে তার বর্গ ও সূর্য থেকে ঐ গ্রহের গড় দূরত্বের ঘনফলের অনুপাত প্রতিটি গ্রহের ক্ষেত্রে সমান।



কেপলারের এই আবিষ্কার শুধু তাত্ত্বিক ছিলো না, বরং সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহসমূহের গতির বর্ণনায় তিনি জ্যামিতি প্রয়োগ করেছেন এবং এইভাবে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্কের গাণিতিক ব্যাখ্যা তৈরি করেছেন। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে যেসব ব্যাখ্যা ছিল, কেপলারের সূত্র তার মধ্যে সহজতম। তাঁর সূত্র ও ব্যাখ্যা পৃথিবী ও বিশ্বজগত সম্পর্কে মানুষের পুরনো সব ধারণাকে বদলে দিলো। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথমদিককার অসাধারণ ঘটনাসমূহের অন্যতম হচ্ছে কেপলারের এই গাণিতিক সিদ্ধান্ত। ১৬৩০ সালে কেপলারের মৃত্যু হয়।

পৃথিবী ও গ্রহসমূহের উপবৃত্তাকার পরিভ্রমণ সম্পর্কিত কেপলারের সিদ্ধান্ত ছিল নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। থ্যালিস থেকে কেপলার পর্যন্ত কয়েক হাজার বছর ধরে অসংখ্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সৌরমণ্ডলীর

সঠিক পদ্ধতি নির্ণয়ের যে চেষ্টা করে আসছিলেন, কেপলারের সিদ্ধান্ত সেই চেষ্টার অবসান সূচিত করে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে কেপলার একটি সুদীর্ঘ ও পুরনো বিতর্কের পরিসমাপ্তি নিয়ে আসেন। আর কেপলারের এই সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল, নিউটন তারই প্রমাণ উপস্থিত করলেন। নিউটন কেপলারের আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক প্রমাণই শুধু প্রদান করেন নি, বরং তিনি এও প্রমাণ করেছেন যে, কেপলারের পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি দ্বারা সৌরমণ্ডলের গতিসমূহের ব্যাখ্যা মোটেই সম্ভব নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চিকিৎসাশাস্ত্রের আদি পর্ব

এতক্ষণ আমরা শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথাই বলেছি। বলেছি সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে অর্থাৎ সৌরকেন্দ্রিকতাবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বিজ্ঞানীদের সত্যনিষ্ঠ সংগ্রামের কথা। কিন্তু ঠিক এই সময়ে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় কি ঘটেছিলো? ধরা যাক চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথাই। প্রাচীনকাল থেকেই তো এই চিকিৎসাবিজ্ঞান ছিল অর্থাৎ রোগ-শোকে কবিরাজ বা বৈদ্যরা লোকের চিকিৎসা করতো। কিন্তু মানুষের দেহ সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে, দেহের অভ্যন্তরের নানা বিষয় জানার পর বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিকিৎসা শুরু হয়েছে কখন থেকে? অর্থাৎ আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের শুরু কখন? কখনই-বা মানুষ মানুষের শরীর সম্পর্কে জানতে শিখলো? প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা উল্লেখ করেছিলাম, অ্যারিস্টটল চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান সম্পর্কে বহু কথা বলেছিলেন। তিনি ছাড়াও গ্যালেন নামে এক রোমান পণ্ডিত খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে শারীরবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। আর সবচেয়ে মজার কথা হলো, বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপে শারীরবিদ্যা সম্পর্কে গ্যালেন-এর ধ্যান-ধারণাকেই অভ্রান্ত ও চূড়ান্ত বলে মনে করা হতো।

গ্যালেন

গ্যালেন ছিলেন গ্লাডিয়েটারদের ডাক্তার। গ্লাডিয়েটার শব্দটা রোমান-দের নিকট খুবই পরিচিত। তখনকার রোমে বড়লোক এবং রাজ-রাজড়াদের প্রিয় আনন্দ ছিল মল্লযুদ্ধ। এই মল্লযুদ্ধে যোদ্ধারা তলোয়ার অথবা অন্য কোনো ক্ষুরধার অস্ত্র নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতো। এতে এক মল্লযোদ্ধা আরেক মল্লযোদ্ধাকে মেরে ফেললেও কোনো অপরাধ হতো না।

রাজরাজড়া আর বড়লোকেরা বিপুল উল্লাসে এইসব খুনোখুনি দেখতো। এই মল্লযোদ্ধাদেরই বলা হতো গ্লাডিয়েটার।

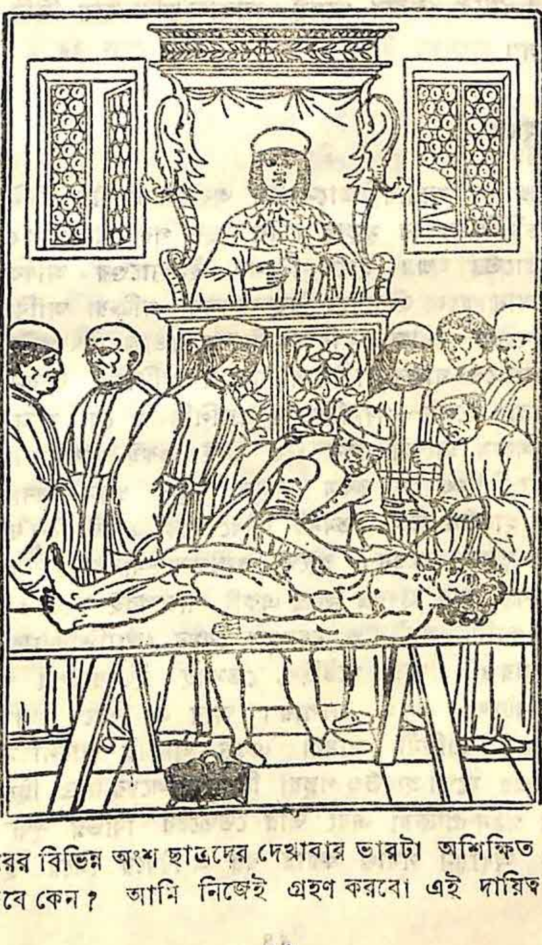
গ্যালেন এদের ডাক্তার ছিলেন বলেই মরা আর আধমরা মানুষের ওপর ছুরি-কাঁচি চালাতে পারতেন অবাধে। এভাবেই গ্যালেন মানব-দেহ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারেন। কিন্তু তাঁর এই জ্ঞান মোটেই নিখুঁত ছিল না। এই তথ্য অবশ্য জানা গেল বহুকাল পর।

কেন? না, গ্যালেনের পর বহুকাল আর অন্য কেউ নিজ হাতে মড়া কেটে দেখেন নি। এমনকি ছাত্রদের শারীরবিজ্ঞান ক্লাশেও কেউ আর নিজ হাতে মড়া কাটতো না। অধ্যাপক উঁচু জায়গায় বসে

গড়গড় করে পড়ে যেতেন আর নাপিত ধরনের একটি লোক মড়া কেটে ছাত্রদের দেখাতো। কিন্তু দেখা যেতো অনেক ক্ষেত্রেই গ্যালেনের বইয়ের সঙ্গে সত্যিকারের মানবদেহের কোনো মিল নেই। তবুও কিন্তু ছাত্র কিংবা অধ্যাপক কেউই নিজের হাতে মড়া কাটতো না। মড়া কাটা অশিক্ষিত নাপিতদেরই কাজ—অভিজাত লোকেরা তা করবে না। এর ফলে গ্যালেনের অই ভুল তথ্যই ছেলেরা শিখতে লাগলো।

ভেসিলিউস

প্রথম যিনি এই অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন তাঁর নাম ভেসিলিউস। শারীরবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হবার পর তিনি বললেন, মড়া কেটে



কেটে শরীরের বিভিন্ন অংশ ছাত্রদের দেখাবার ভারটা অশিক্ষিত নাপিতদের ওপর থাকবে কেন? আমি নিজেই গ্রহণ করবো এই দায়িত্ব।

ভেসিলিউস-এর জন্ম ১৫১৪ সালে। ২৩ বছর বয়সে তিনি পদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমির অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মানবদেহের গঠন সম্পর্কে ভেসিলিউস-এর প্রথম বইটি প্রকাশিত হয়। এই বছরটা অবশ্যই স্মরণীয়, কেননা সৌরজগত সম্পর্কে কপার্নিকাসের বইটিও প্রকাশিত হয় এই একই বছরে।

এই বই প্রকাশ কিন্তু ভেসিলিউস-এর জন্যে কাল হলো। মানবদেহ সম্পর্কে তাঁর বাস্তব তথ্য বহু অন্ধ কুসংস্কারের মূলে হানলো আঘাত। অতএব পাদ্রী-পুরোহিতের দল ক্ষেপে উঠলো। তারা বললো, ভেসিলিউস পাপ করেছেন। অতএব তাঁকে পাপ স্খালনের জন্য তীর্থ করতে হবে। জোর করে তীর্থে অর্থাৎ জেরুজালেম পাঠানো হলো তাঁকে। তীর্থ থেকে ফেরার পথেই জাহাজ-ডুবি হয়ে তিনি মারা যান ১৫৬৪ সালে।

উইলিয়াম হার্ভে

ভেসিলিউসের পর শারীরবিজ্ঞানে যাঁর অবদান স্মরণীয় তিনি উইলিয়াম হার্ভে। ভেসিলিউস-এর মৃত্যুর চৌদ্দ বছর পর অর্থাৎ ১৫৭৮ সালে উইলিয়াম হার্ভের জন্ম। হার্ভে ছিলেন ইংল্যাণ্ডের অধিবাসী। তাঁর স্মরণীয় অবদান হচ্ছে জীবদেহে রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া আবিষ্কার। হার্ভে জীববিদ্যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী এবং তিনি তাঁর তত্ত্বগুলোকে বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসকাররা বলেন—পদার্থবিদ্যায় গ্যালিলিওর যে স্থান জীববিদ্যার ক্ষেত্রে ইউলিয়াম হার্ভের স্থান ঠিক সেই একই জায়গায়। সৌরজগত সম্পর্কে গ্যালিলিও যে রকম নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার সূত্রপাত করেছিলেন, হার্ভেও ঠিক তেমনই জীবদেহকে একটি নিখুঁত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন। হার্ভে বলতেন—মানবদেহ হচ্ছে একটি হাইড্রলিক যন্ত্র আর হৃদযন্ত্র হচ্ছে একটি পাম্পেরই মতো।

আমরা জানি, প্রাচীন ও মধ্যযুগে যেমন জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যারও প্রসার ঘটেছিল, তেমনই ইউরোপের পুনর্জাগরণের সময়টিতেও ঘটলো একই ব্যাপার। আর এ বিষয়ে গ্যালেন এবং ভেসিলিউস-এর কাহিনী আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি। ভেসিলিউস-এর মতো হার্ভেও পদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। হার্ভে মানবদেহের গঠন-প্রক্রিয়া এবং তার ভেতরের বিভিন্ন সূক্ষ্ম কাজকর্মের পরীক্ষামূলক অধ্যয়ন সমাপ্ত করার পর এ বিষয়ে নিয়ে হাতে-কলমে

কাজ করা শুরু করেন। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত বই 'অ্যান অ্যানাটমিক্যাল ডিসারটেশন অন দি মুভমেন্ট অব দি হার্ট অ্যাণ্ড ব্লাড ইন অ্যানিমেলস' অর্থাৎ প্রাণীদেহে হৃদযন্ত্র ও রক্তের সঞ্চালন সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। এই বইটিতে তিনি বিভিন্ন প্রাণীদেহের গঠনের বৈচিত্র্য এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মের বিবরণ প্রদান করেছেন বিস্তৃতভাবে। হার্ভেই প্রথম উল্লেখ করেন যে, রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমেই দেহের বিভিন্ন কোষের প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করা সম্ভব।

হার্ভে ছিলেন ফ্রান্সিস বেকনের চিকিৎসক এবং একই সঙ্গে ইংলণ্ড-রাজ প্রথম চার্লস-এরও। তাঁর চৌষট্টি বছর বয়সের সময় ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই সময়ে এজহিল যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি প্রিন্স অব ওয়েলস এবং ডিউক অব ওয়েলস-এর চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি সারাক্ষণ একটি ঝোপের পাশে বসে বই পড়তেন।

কিন্তু রাজার এই সমর্থন সত্ত্বেও ইউলিয়াম হার্ভে কি কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীর হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন? না, মোটেই নয়। হার্ভে যখন একবার রাজার সাথে নটিংহাম ছিলেন সেই সময় উন্মত্ত জনতা তাঁর লণ্ডনের বাড়িটি ধূলিস্মাৎ করে দেয়। তারা তাঁর সমস্ত কাগজ-পত্রও পুড়িয়ে ফেলে। এই কাগজগুলোর মধ্যে ছিলো তাঁর বহু বছরের সাধনার ধন কীট ও পোকা সম্পর্কিত এক গবেষণার ফসল। বাড়ি ধ্বংস হওয়ায় তিনি যতটা না দুঃখ পেয়েছিলেন তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন এই কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ায়। হয়তো সব সত্যসন্ধানীর জীবনে এমনি ঘটনাই ঘটে। অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীর হাতে ভোগ করতে হয় তাদের এমনি লাঞ্ছনা।

চিকিৎসাবিদ্যার কাহিনী এখানেই শেষ আপাতত। এবার আমরা ফিরছি আবার সেই পদার্থবিদ্যার জগতে। কিন্তু তার আগে একটি কথা অবশ্যিই বলতে হয় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানচর্চায় যে বিষয়টি সব-চেয়ে বেশী লক্ষ্য করার মতো তা হচ্ছে, এই সময় থেকেই বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি খুব বেশি করে ব্যবহৃত হতে থাকে। সারা ইউরোপ জুড়েই এই বাস্তব পরীক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়।

টরিসেলির নল

সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে খনি খনন ইত্যাদি কাজে লিফট পাম্প-এর ব্যবহার বেড়ে যায়। কিন্তু দেখা যেতো, এর সাহায্যে ৩৪ ফুট-এর বেশি গভীরতা থেকে পানি তোলা যায় না। গ্যালিলিও বললেন, ৩৪ ফুটের বেশি দীর্ঘ পানির স্তম্ভ তার আপন ওজনের কারণেই ভেঙে যায়। কিন্তু গ্যালিলিওর এই ধারণা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তাঁর ছাত্র ইভান-জেলিস্তা টরিসেলি এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। তিনি পানির চেয়ে প্রায় ১৪ গুণ বেশি ভারী পারদ দিয়ে একটি পরীক্ষা করলেন। এক গজ লম্বা একটি কাচের নলের একদিক বন্ধ করে তিনি তাতে পারদ ঢুকিয়ে তারপর নলটিকে উপুড় করে ধরলেন। দেখা গেলো, পারদের উচ্চতা হয়েছে ৩০ ইঞ্চি। আর তার ওপরে নলটি ফাঁকা অর্থাৎ সেখানে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এদিকে অ্যারিস্টটল বলে গিয়েছিলেন, জগতে কোনো স্থানই শূন্য থাকতে পারে না। তাহলে পারদের স্তম্ভ কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে? এই পরীক্ষাটি ১৬৪৩ সালে ফ্লোরেন্স শহরে সম্পন্ন করা হয়। তখন বিজ্ঞানীরা সবাই জেনে গেছেন যে, বাতাসেরও ওজন আছে। টরিসেলি বললেন—পারদের ওপর বাতাসের চাপের ফলেই পারদের এই স্তম্ভ টিকে থাকছে। আজকাল আমরা বাতাসের চাপ মাপার জন্য ব্যারোমিটার ব্যবহার করে থাকি। টরিসেলির এই নলটিকে আদি ব্যারোমিটার বলা যেতে পারে।

টরিসেলির এই পরীক্ষার কথা শীঘ্রই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে ফ্রান্সে বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় আলোচনার জন্যে বিভিন্ন ছোট ছোট দল গঠিত হয়েছিল। এদের মধ্যে একটি দলের সদস্য ছিলেন—এতিয়েনে পাস্কেল। ব্লেইজি পাস্কেল এই এতিয়েনে পাস্কেলেরই পুত্র। এতিয়েনে তাঁর পুত্রকে স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে নিজেই শিক্ষা দিতে শুরু করেন।

পাস্কেল

১৬৪৬ সালে, ব্লেইজির যখন ২৩ বছর বয়স তখন তিনি প্রথমে টরি-সেলির পরীক্ষার কথা জানতে পারেন। ফ্রান্সের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী পিয়েরে পেটিট পাস্কেলদের এ কথা জানান। তখন তাঁরা একটা কাচের নল নিয়ে পারদ দিয়ে আবার পরীক্ষাটি সম্পাদন করেন। এবারেও দেখা গেলো, পারদ-স্তম্ভের উচ্চতা হচ্ছে ৩০ ইঞ্চি এবং পারদের উপরে

কাচের নলের মধ্যে শূন্য একটি স্থান রয়ে গেছে। ব্লেইজি পাস্কেল এবার পানি দিয়েও অনুরূপ পরীক্ষা চালালেন। তিনি পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব হিসাব করে দেখলেন, পানির ক্ষেত্রে যদি পানির স্তম্ভের উচ্চতা ৩৪ ফুট হয়, তাহলে পারদের উচ্চতা ঠিকই ৩০ ইঞ্চি হবে। আর সে অনুপাতে কাচের নলে রক্তিম মদ্যজাতীয় তরল পদার্থের উচ্চতা হবে ৩৪·৬ ফুট। বাস্তব পরীক্ষায়ও এটিই ঘটলো।

এভাবেই পাস্কেল বাতাসের চাপের সঙ্গে তরল পদার্থের চাপের একটি সম্পর্ক নির্ণয় করলেন।

রেনে দেকার্তে

এই সময়ে ফ্রান্সে আরও একজন বিখ্যাত মনীষীর জন্ম হয়েছিল। তিনি রেনে দেকার্তে। দেকার্তে ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ। ১৫৯৬ সালে তাঁর জন্ম হয়। তিনি বিজ্ঞানে ব্যবহারের জন্যে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দেকার্তে বিশ্বাস করতেন—বিশ্বের যাবতীয় বিষয়কে গণিতের ভাষায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। বস্তুত দেকার্তের এই বিশ্বাস অতিরঞ্জন নয়। কেননা, আজকের আধুনিক বিজ্ঞান গাণিতিক ভাষার ওপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল।

গণিতে দেকার্তের যুগান্তকারী আবিষ্কার 'কার্টেসিয় স্থানাঙ্ক পদ্ধতি'। সেকালে পণ্ডিতসমাজে ল্যাটিন ভাষায় নাম লেখার চল ছিল। দেকার্তে ল্যাটিনে তাঁর নাম লিখতেন, রেনেটাস কার্টেসিয়াস। তাঁর এই ল্যাটিন নাম অনুসারেই তাঁর আবিষ্কৃত স্থানাঙ্ক পদ্ধতির নাম হয়েছে 'কার্টেসিয় স্থানাঙ্ক পদ্ধতি'। এই পদ্ধতি আবিষ্কার নিয়ে দেকার্তে সম্পর্কে একটি মজার গল্প চালু আছে। একদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি একটি মাছির ওড়া লক্ষ্য করছিলেন। তখন তাঁর মনে এলো, কোনো বিশেষ মুহূর্তে মাছিটি ঘরের কোন্ বিন্দুতে আছে তা কিভাবে নির্দেশ করা যায়? তিনি দেখলেন, ঘরের কোনো একটি বিন্দুতে যদি পরস্পর লম্ব তিনটি তল কল্পনা করা হয়, তাহলে ঐ বিন্দুকে অর্থাৎ তল তিনটির ছেদবিন্দুকে মূল বিন্দু ধরে নিয়ে তার সাথে তুলনা করে মাছিটির অবস্থান নির্দেশ করা যাবে। এজন্য ঐসব তল থেকে মাছিটির দূরত্ব জানলেই শুধু চলবে। তেমনিভাবে কোনো তলের ওপর কোনো বিন্দুর অবস্থান নির্দিষ্টভাবে জানতে হলে ঐ তলের ওপর যে কোনো বিন্দুতে লম্বালম্বিভাবে আঁকা দু'টি সরলরেখা থেকে ঐ বিন্দুটির দূরত্ব জানতে হবে। যে বিন্দুতে লম্ব দু'টি আঁকা হয় তাকে 'মূল বিন্দু'

এবং লম্ব দু'টিকে 'অক্ষ' বলা হয়। আর অক্ষদ্বয় থেকে বিন্দুটির দূরত্বকে বলে 'ভুজ' ও 'কোটি'।

দেকার্তের এই পদ্ধতি অনুসারে সমতলে অবস্থিত যে কোনো বিন্দুকে মাত্র দু'টি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায়। যেমন, কোনো বিন্দুর অবস্থান (৪, ৮) বলতে বোঝায় মূলবিন্দু থেকে চার একক পূর্বে এবং আট একক উত্তরে অবস্থিত কোনো বিন্দু। তেমনি (-৪,-৮) বলতে মূলবিন্দু থেকে চার একক পশ্চিমে এবং আট একক দক্ষিণে অবস্থিত কোনো বিন্দুকে বোঝায়। শূন্যে কোনো বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করার জন্য তৃতীয় একটি সংখ্যার দরকার হয়। এই সংখ্যাটি নির্দেশ করবে বিন্দুটি মূলবিন্দু থেকে উপরে না নিচে অবস্থিত।

কার্টেসিয় পদ্ধতিতে বীজগণিতের সমীকরণকে জ্যামিতিক চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা যায়। এই পদ্ধতির নাম লেখচিত্র বা গ্রাফ। দেকার্তে এভাবে বীজগণিত ও জ্যামিতিকে একত্রিত করেন এবং বিশ্লেষণী জ্যামিতির সূচনা করেন। তাঁর এই অবদানই পরবর্তীকালে নিউটনের ক্যালকুলাস আবিষ্কারের পথ সুগম করে দেয়।

১৬২৮ সালে দেকার্তে স্বদেশ ত্যাগ করে হল্যাণ্ডে চলে যান এবং এখান থেকেই তাঁর বিখ্যাত বই 'রীতিবিষয়ক আলোচনা' প্রকাশিত হয় ১৬৩৭ সালে।

অটো ফন গ্যোরিক

একটু আগে আমরা টরিসেলির যে বিখ্যাত পরীক্ষার কথা বলেছি সে প্রসঙ্গে আর একজন জার্মান পণ্ডিতের কথা না বললে এই কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ইনি অটো ফন গ্যোরিক। ১৬০২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন জার্মানীর ম্যাগডিবার্গে। ফন গ্যোরিক প্রথমে পানির পাম্প দ্বারা শূন্য স্থান তৈরির চেষ্টা করেন। পরে তিনি নিজেই একটি বায়ু-পাম্প বা এয়ার-পাম্প নির্মাণ করেন। এই বায়ু-পাম্পের সাহায্যে তিনি দেখান, কোনো গোলকের মধ্যে যদি বাতাস বা অন্যকিছু না থাকে তাহলে সেই শূন্য গোলকটির দু'দিকের অর্ধগোলককে বিচ্ছিন্ন করতে অকল্পনীয় শক্তির প্রয়োজন হয়। ফন গ্যোরিক-এর এই গোলকের নাম দেওয়া হয় ম্যাগডিবার্গের শূন্য গোলক।

১৬৫১ সালে গ্যোরিক সম্রাট তৃতীয় ফার্দিনান্দ-এর সামনে এই পরীক্ষাকার্যটি দেখান। এ সময় শূন্য অর্ধগোলক দু'টিকে পৃথক করার জন্য গোলকের দুই দিকে আটটি করে ঘোড়া জুড়ে দেওয়া হয়। এতেই দেখা যায়, যে বাতাসের মধ্যে আমরা ডুবে আছি সে বাতাসের চাপ

কত বেশি। ফন গ্যোরিক এভাবে একটি ধাতব গোলকের সাহায্যে বাতাসের ঘনত্ব পরিমাপ করেন। তিনি কাচের নলে পানির স্তম্ভের সাহায্যে একটি ব্যারোমিটার স্থাপন করেন এবং এভাবে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। আর এই ব্যারোমিটারের সাহায্যেই তিনি ১৬৬০ সালে ঝড়ের পূর্বাভাষ জানিয়েছিলেন। ফন গ্যোরিক দেখিয়েছিলেন শূন্যস্থানের ভেতর দিয়ে শব্দ যেতে পারে না, কিন্তু আলো যেতে পারে। অটো ফন গ্যোরিক ১৬৮৬ সালে ৮৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

রবার্ট বয়েলের এয়ার পাম্প

টরিসেলি, পাস্কেল এবং গ্যোরিক-এর পর বায়ুর চাপ সম্পর্কিত গবেষণায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল। রবার্ট বয়েল-এর জন্ম ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে। ইংল্যাণ্ডে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃতদের অন্যতম হচ্ছেন রবার্ট বয়েল। বিলাতের এক অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ডে রয়েল সোসাইটির সদস্যরা যখন কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত নির্মাণে তৎপর ছিলেন, তখন পুরোহিতরা প্রচার করতে শুরু করে যে, রয়েল সোসাইটি খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু রবার্ট বয়েল ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত ধার্মিক ও দয়ালু ছিলেন। অথচ অন্যদিকে তিনি রয়েল সোসাইটির বিজ্ঞানান্দোলনের সঙ্গে ছিলেন গভীরভাবে যুক্ত। ফলে অচিরেই তিনি পুরোহিতদের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে রয়েল সোসাইটির প্রধান প্রবক্তা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

১৬৪৫ সাল থেকেই রবার্ট বয়েল এয়ার পাম্প নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা শুরু করেন এবং পরে তাঁর সহকারী রবার্ট হুক-এর সহযোগিতায় তিনি তাঁর নিজস্ব নকশা অনুযায়ী একটি নতুন এয়ার পাম্প নির্মাণ করেন। লণ্ডনের বিদ্বান ব্যক্তিরা প্রতি সপ্তাহে কোনো সারাইখানা বা কফি হাউস অথবা গ্রেসাম কলেজে বসে বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। রবার্ট বয়েল এই আলোচনাচক্রকে 'ইনভিজিবল কলেজ' বলতেন। ১৬৫৪ সালে অক্সফোর্ডে স্থায়ীভাবে বাসগৃহ স্থাপনের পর রবার্ট বয়েল নিজেও 'ইনভিজিবল কলেজ' দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। পরে প্রধানত রবার্ট বয়েল এবং অন্যান্যদের উদ্যোগে এই দলকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় রয়েল সোসাইটি। ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে রয়েল সোসাইটি রাজকীয় সনদ লাভ করে

অর্থাৎ রাজার স্বীকৃতি পায়। নতুন এয়ার পাম্প তৈরির পর লোকেরা এর নাম দিয়েছিল বয়েল এঞ্জিন এবং তাঁর এই আবিষ্কার সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে গৃহীত হয়।

আজকাল বিজ্ঞান অধ্যয়নকালে প্রায় প্রথম দিকেই বয়েল-এর গ্যাস সম্পর্কিত সূত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। এই সূত্রে বলা হয়েছে— 'তাপমাত্রা, অপরিবর্তিত থাকলে কোনো নির্দিষ্ট ভরে গ্যাসের আয়তন বায়ুর চাপের সঙ্গে বিপরীতভাবে সম্পর্কিত' অর্থাৎ বায়ুর চাপ বাড়লে গ্যাসের আয়তন কমে যায় এবং বায়ুর চাপ কমলে গ্যাসের আয়তন বাড়ে। বয়েল-এর এই সূত্র 'বয়েলস্ ল' বা বয়েলের সূত্র নামে পরিচিত।

গাছের আপেল মাটির মানুষ

গ্যালিলিও যে বছর মারা গেলেন, সে বছর নিউটনের জন্ম। ১৬৪২ সালে ক্রিসমাসের দিনে লিংকনশায়ার-এর গ্রান্থাম-এর কাছে একটি গ্রামে। প্রায় পঁচাশি বছর বেঁচেছিলেন তিনি। আর এই পঁচাশি বছরের জীবনে তিনি অক্লান্তভাবে বিজ্ঞানের সেবা করে গেছেন। গ্যালিলিও গতিবিজ্ঞানের যে সূত্র নির্দেশ করেছিলেন, নিউটন সে সূত্রসমূহ যথাযথভাবে উপস্থাপিত করেন। আমরা পদার্থবিজ্ঞানের শুরুতেই পাই নিউটনের এই সূত্রসমূহ। এগুলোকে 'নিউটনস্ ল' বলা হয়। গতিসম্বন্ধীয় নিউটনের সূত্র তিনটি হচ্ছে:

ক. কোনো ভরের উপর বলের লব্ধি শূন্য হলে, তা স্থির থাকবে কিংবা সমবেগে সরলপথে চলবে।

খ. বস্তুর ভরবেগ পরিবর্তনের হার বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং ভরবেগের পরিবর্তন প্রযুক্ত বলের দিকেই হবে।

গ. প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত ক্রিয়া রয়েছে।

নিউটনের আরেকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব। গল্পে আছে: একদিন বাগানে বসে কি যেন ভাবছিলেন নিউটন, অই সময় আপেল গাছ থেকে একটি আপেল পড়তে দেখে, হঠাৎ তাঁর মনে একটি প্রশ্ন জাগে—'আপেল নিচে পড়ে কেন'? এ থেকেই মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কার হয়। এই তত্ত্বে বলা হয়, পৃথিবীপৃষ্ঠের সকল বস্তুই পৃথিবী কর্তৃক আকৃষ্ট হয় এবং এই আকর্ষণের পেছনে নির্দিষ্ট 'বল' কাজ করে। এই বলকে বলা হয় মাধ্যাকর্ষণ বল।

ছোটবেলা থেকেই নিউটন ছোটখাট জিনিস তৈরি করতে ভালোবাসতেন। তাঁর ছিল ছোট করাত, হাতুড়ি আর নানারকম হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি। গ্রান্থাম-এর কিংগস স্কুলে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। এই স্কুলে নিউটন চার বছর পড়াশোনা করেন। এরপর তাঁর মা তাঁকে স্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। মায়ের ইচ্ছা ছিল ছেলে বাড়িতে

বসে খেতখামারের কাজ করুক। কিন্তু কৃষিকাজ করা বোধ হয় নিউটনের ভাগ্যে ছিল না, পড়াশোনায় তাঁর আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। তাই তাঁর চাচার অনুরোধে তাঁর মা আবার তাঁকে কিংগস স্কুলে ফেরত পাঠান। এখানকার পড়া শেষ করে তিনি ১৬৬১ সালে কেম্ব্রিজ-এর ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। এখানে তিনি গণিতশাস্ত্র এবং আলোকবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। ১৬৬৫ সালে কেমব্রিজ-এর ডিগ্রী লাভের পর নিউটন আবার তাঁর নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। মহামারী আকারে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ার কারণে তখন কলেজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে থাকার সময় নিউটন নিশ্চেষ্ট বসে ছিলেন না। তিনি তখন নানা বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তারপর যখন তিনি কেমব্রিজ প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন। মাত্র ২৭ বছর বয়সে নিউটন গণিতশাস্ত্রের লুকাসিয়ান অধ্যাপক নিযুক্ত হন।



নিউটন তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার ফলাফল ইত্যাদি নিয়ে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এই বইটির নাম 'ম্যাথম্যাথিক্যাল প্রিন্সিপলস্ অব ন্যাচারাল ফিলসফি'। বইটি লিখতে তাঁর আঠারো মাস সময় লাগে। এই আঠারো মাস কদাচিৎ তিনি ট্রিনিটিতে তাঁর ঘর থেকে বের হতেন। সময় সময় তিনি তাঁর কাজ নিয়ে এতো বেশি ব্যস্ত থাকতেন যে, খাওয়া-গোসলের কথাও তাঁর মনে থাকতো না। বইটি নিউটন লিখেছিলেন ল্যাটিন ভাষায়। ১৬৮৭ সালে বইটি প্রকাশিত হয়।

১৭০৩ সালে নিউটন রয়েল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। এরপর ১৭২৭ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি প্রতি বছরই রয়েল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এ সময়ে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তাঁর বক্তব্যই ছিল সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনালগ্নে স্যার আইজাক নিউটনের আবির্ভাব। বলবিদ্যা, আলোকতত্ত্ব এবং মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর অতুলনীয় অবদান রয়েছে। তিনি সব বিষয়ে তাঁর সমকালীন বিজ্ঞানীদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। বলা যায়, বিজ্ঞানের জগতে তিনি ছিলেন তখন একচ্ছত্র সম্রাট।

নিউটনের সহযাত্রী

নিউটনের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের অবদানও অবশ্যই অনস্বীকার্য। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন রবার্ট হুক, ক্রিস্টোফার রেন, এডমাণ্ড হ্যালি। রবার্ট হুক ছিলেন রয়েল সোসাইটির কিউরেটর। তাঁর জন্ম ১৬৩৫ সালে। তিনিও সারা জীবন রয়েল সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ে সৌরজগৎ এবং গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি নিয়ে যাঁরা নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন, হুক এবং হ্যালি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৬৭৯ সালে ওল্ডেনবর্গের মৃত্যুর পর হুক রয়েল সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন।

নিউটন, রেন, হুক এবং হ্যালি—এঁরা চারজনই মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব এবং সৌরতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এঁদের সঙ্গে আরো দু'জন বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাঁরা সৌরতত্ত্ব এবং এই বিষয় নিয়ে নানারকম গাণিতিক কাজ করেছিলেন। এঁরা হচ্ছেন—রেনে দেকার্তে এবং লাপলাস। এঁরা দু'জনই ফরাসী। দেকার্তের কথা আমরা আগেও একটু বলেছি। রেনে দেকার্তের জন্ম ১৫৯৬ সালে। তিনি জেসুইট কলেজসমূহের মধ্যে বিখ্যাত লা ফ্লেচ-এ লেখাপড়া করেন। তরুণ বয়সে দেকার্তে জার্মানীতে সেনা বিভাগে কাজ করেন। পরে তিনি ঝুঁকে পড়েন দর্শন ও গণিতের প্রতি। দেকার্তে ছিলেন তাঁর যুগের বিখ্যাত গণিতবিদ এবং কো-অর্ডিনেট জিওমেট্রি অর্থাৎ স্থানাঙ্ক জ্যামিতির উদ্ভাবক। দর্শন বিষয়ে তিনি ছিলেন দ্বৈতবাদী। তাঁর বক্তব্য ছিল, বস্তু এবং মন, এই দুটোই হচ্ছে বাস্তব। দেকার্তে বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে অনুৎসাহী ছিলেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি তাঁর কক্ষে বসে অথবা বিছানায় শুয়ে দর্শন কিংবা গণিত বিষয়ে চিন্তা করতেন। ৫৩ বছর বয়সে দেকার্তে সুইডেনের রানী ক্রিশ্চিনার শিক্ষক

নিযুক্ত হন। তাঁকে সুইডেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রানী একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রানীর শিক্ষকতাই তাঁর জীবনের কাল হলো। রানী ভোর পাঁচটার সময় উঠে পড়া শুরু করতেন। দেকার্তেকেও ওই সময়ে উঠতে হতো। এভাবে তাঁর একদিন ঠাণ্ডা লেগে যায়। এতে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এই অসুস্থ অবস্থায় ১৬৫০ সালে পরলোক গমন করেন।

লিপজিগের লাইবনিৎস

আমরা দেকার্তের সঙ্গে আরো একজনের নাম উল্লেখ করেছিলাম। তিনি লাপলাস। লাপলাসের জন্ম ১৭৪৯ সালে। তবে তাঁর কথা বলার আগে আরেকজনের কথা বলা দরকার। ইনি লাইবনিৎস। উচ্চতর বিজ্ঞান অধ্যয়নে যে গণিতের প্রয়োজন তার মধ্যে ক্যালকুলাস অন্যতম। এই ক্যালকুলাসের উদ্ভাবক কে তা নিয়ে একটু তর্ক-বিতর্ক আছে। নিউটন এবং লাইবনিৎস দু'জনই দাবি করেছেন প্রথম ক্যালকুলাস উদ্ভাবনের। অবশ্য এটা জানা গেছে যে, নিউটনই প্রথম ক্যালকুলাস উদ্ভাবন করেন, কিন্তু লাইবনিৎসই প্রথম ক্যালকুলাস সম্পর্কে রচনা প্রকাশ করেন। লাইবনিৎসের জন্ম ১৬৪৬ সালের ১লা জুলাই, নিউটনের জন্মের চার বছর পর, জার্মানীর লিপজিগ শহরে। তাঁর পিতা ছিলেন ন্যায়-দর্শনের অধ্যাপক। ছ'বছর বয়সে লাবইনিৎস পিতৃহীন হন। তাঁর পিতার ছিল বিরাট এক গ্রন্থাগার। লাইবনিৎস এই গ্রন্থাগারে বসে বসে পড়তেন। বারো বছর বয়সে তিনি ল্যাটিন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। পনেরো বছর বয়সে লাইবনিৎস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি ছিলেন আইনের ছাত্র। দর্শন বিষয়ে তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেন এবং কেপলার, গ্যালিলিও ও দেকার্তের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। এ থেকেই গণিতশাস্ত্রের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে। ১৬৬৩ সালের গ্রীষ্মকালে জেনা বিশ্ববিদ্যলয়ে তিনি গণিতশাস্ত্রের ওপর এরহার্ড জিগেল-এর বক্তৃতা শোনেন অত্যন্ত আগ্রহের সাথে। ২৬ বছর বয়সে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ হাইগেনস-এর কাছে তিনি গণিত পড়া শুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই গণিতের বিশেষজ্ঞ হন। ৭০ বছর বয়সে ১৭১৬ সালের ১৪ই নভেম্বর হ্যানোভার শহরে তিনি মারা যান।

সমসাময়িকদের মধ্যে আরেকজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ হচ্ছেন মার্কুইস পিয়েরে সিমন দ্য লাপলাস। তাঁর জন্ম ১৭৪৯ সালের ২৩শে মার্চ, ফ্রান্সের এক কৃষক পরিবারে। তিনি ছিলেন গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ। তাঁকে বলা হতো ফ্রান্সের নিউটন। গণিতজ্ঞ হিসেবে তাঁর অবদান হচ্ছে যে, তাঁকে সাধারণত প্রোবেবিলিটি তত্ত্বের আধুনিক পর্যায়ের জনক বলা যায়। ছেলেবেলা থেকেই গণিতশাস্ত্রের প্রতি তাঁর অসাধারণ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। আর ছিল তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি। গণিতশাস্ত্রে লাপলাসের অবদান অবিস্মরণীয়। লাপলাস নেপোলিয়নের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি লাপলাসকে উচ্চ রাজকার্যেও নিযুক্ত করেছিলেন।

৭৮ বছর বয়সে ১৮২৭ সালের ৫ই মার্চ তারিখে সামান্য অসুখের পর তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

নিউটন এবং তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হলো। এখানে আমাদের মনে রাখা উচিত, এই সময়ে পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে যে গবেষণা হয়েছে তা ছিলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তত্ত্বমূলক। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে এর প্রভাব বিরাট। বস্তুত নিউটনের হাতেই আধুনিক বলবিদ্যা অথবা মেকানিক্সের সূত্রপাত। ভবিষ্যতের প্রযুক্তিবিদ্যার শুরুও এখানেই। আধুনিক প্রযুক্তির একেবারে প্রথম দিককার আবিষ্কারসমূহ ছিল ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কিত। বলা যায়, শিল্প প্রসারের প্রয়োজনই ছিল প্রযুক্তির প্রেরণা।

বাষ্পীয় ইঞ্জিন

প্রযুক্তিবিদ্যার শুরুতে প্রথম যে ইঞ্জিন তৈরি হয়েছিলো তা ছিল বাষ্পীয় ইঞ্জিন। ফুটন্ত পানির বাষ্প যে মানুষের অনেক কাজ সহজ করতে পারবে তা প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন জেমস ওয়াট। জেমস ওয়াটের জন্ম ১৭৩৬ সালে, ইংল্যাণ্ডে। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৌতূহলী ও উদ্ভাবন প্রয়াসী। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে মাত্র ২২ বছর বয়সে এই ব্রিটিশ যন্ত্রবিজ্ঞানী সর্বপ্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন। এটি ছিল একটি বহির্দহন ইঞ্জিন। বাষ্পীয় ইঞ্জিনে প্রথমে চুল্লীতে কয়লা পুড়িয়ে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার সাহায্যে বয়লারের পানিকে বাষ্পে রূপান্তরিত করা হয়। পরে এই বাষ্পকে মূল ইঞ্জিনে প্রয়োগ করে যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন করা হয়। জেমস ওয়াট কিন্তু ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি ক্রমাগত এই ইঞ্জিনকে আরো দক্ষ ও উন্নততর করার চেষ্টা চালিয়ে যান এবং ১৭৬৮ সালে ইতোপূর্বে উদ্ভাবিত বাষ্প-

চালিত ইঞ্জিনের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হন। ইঞ্জিন উদ্ভাবন ছাড়াও জেমস ওয়াট নির্দেশক বা ইণ্ডিকেটর নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন কর্তৃক কৃত কাজের পরিমাণ নির্ণয়ের একটি পদ্ধতিও উদ্ভাবন করেন। ১৮১৯ সালে জেমস ওয়াটের মৃত্যু হয়।

জেমস ওয়াটের পর বাষ্পীয় ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করেন জর্জ স্টিফেনসন। স্টিফেনসন-এর বাবা কাজ করতেন নিউক্যাসেলের কয়লা খনিতে। এসব খনি থেকে ইঞ্জিনের সাহায্যে পাম্প করে পানি তোলা হতো। ছোটবেলায় স্টিফেনসন কখনো স্কুলে গিয়ে পড়াশোনার সুযোগ পান নি। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁকে বাবার সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করতে হয়। এসময় পাম্পিং ইঞ্জিনটা দেখতে জর্জের খুব ভালো লাগতো। অবসর পেলেই তিনি ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন, তারপর মুখস্ত করা নকশা থেকে তৈরি করতেন ইঞ্জিনের মডেল।

জর্জরা ছিলেন খুব গরীব। তাই অবসর সময়ে তিনি ঘড়ি মেরামত ও জুতো সেলাই শুরু করলেন। এভাবে তিনি যা আয় করতেন, তার সবটাই রাখতেন জমিয়ে। অবশেষে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি প্রথম লোকোমোটিভ বা চলমান ইঞ্জিন তৈরি করতে সক্ষম হলেন। কয়লাখনির মালিকদের জর্জ স্টিফেনসনের ইঞ্জিনটা খুব পছন্দ হলো। তাঁরা খনি থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বন্দরে কয়লা নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়ায় টানা ওয়াগনের বদলে জর্জের ইঞ্জিন ব্যবহার করতে রাজি হলেন। এরপর তাঁর চেষ্টায় কাউন্টি ডারহামের স্টকটন থেকে ডার্লিংটন পর্যন্ত ৬১ কিলোমিটার লম্বা রেল লাইন বসানোর কাজ সমাপ্ত হলো ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে। এবং এই লাইনে ইঞ্জিন-টানা গাড়ি মালপত্র ও যাত্রী বহন শুরু করলো। এর মধ্যে স্টিফেনসন তাঁর ছেলে রবার্টের সাহায্যে ইঞ্জিন ও রেললাইন তৈরির কারখানা বসিয়েছিলেন। এবার লিভারপুল থেকে ম্যানচেস্টার পর্যন্ত রেললাইন বসানোর কাজ শুরু হলো। স্টিফেনসন এ প্রকল্পের চীফ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হলেন। ১৮২৯ সালে কাজটি শেষ হলো। এসময় জর্জ ও রবার্ট স্টিফেনসন ঘণ্টায় ষোলো কিলোমিটার চলতে সক্ষম ইঞ্জিন তৈরি করলেন। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর ডিউক অব ওয়েলিংটন রেললাইনটির উদ্বোধন করেন। পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের বড় বড় শহরগুলোকে রেললাইন দিয়ে যোগ করে দেয়া হয়। জর্জ স্টিফেনসনের তত্ত্বাবধানেই ইংল্যাণ্ডে প্রথম রেল-যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৮ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জর্জ স্টিফেনসন ইঞ্জিনের উন্নয়ন এবং রেললাইন বসানোর কাজে ব্যস্ত জীবন অতিবাহিত করেন।

শিল্প-বিপ্লবের সূচনা লগ্নে রেল-ব্যবস্থা সংগঠনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন জর্জ স্টিফেনসন। যন্ত্রবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর রেল ইঞ্জিন উদ্ভাবন ইউরোপে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসে তাঁর এই অবদান প্রকৃত অর্থে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

অন্তর্দহন ইঞ্জিন

জর্জ স্টিফেনসন-এর পর ইঞ্জিন নিয়ে অনেকেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। এঁদের মধ্যে জার্মান যন্ত্রবিজ্ঞানী নিকোলাস অটোর (১৮৩২-৯১) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর আবিষ্কারের ফলেই অন্তর্দহন ইঞ্জিন উদ্ভাবিত হয়। আমরা জানি, যে সকল ইঞ্জিনে সিলিণ্ডারের ভেতরেই জ্বালানি পোড়ানো হয়, সেগুলোকে অন্তর্দহন ইঞ্জিন বলে। পৃথক চুল্লী এবং বয়লার না থাকায় এ ধরনের ইঞ্জিন আকারে অনেক ছোট হয়। মোটরগাড়ি, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে এ ধরনের হালকা ও ক্ষুদ্রাকার ইঞ্জিনই ব্যবহার করা হয়। এতে জ্বালানি হিসেবে পেট্রোলিয়াম জাতীয় তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয়। প্রায় সব ধরনের অন্তর্দহন ইঞ্জিনই চারিঘাত প্রণালীতে কাজ করে। নিকোলস অটো এই পদ্ধতিটির আবিষ্কারক। তাঁর নামানুসারে একে অটো সাইকল বলা হয়।

ডিজেল ইঞ্জিন

পেট্রোলিয়ামের পরিবর্তে ভারি (ডিজেল) তেল ব্যবহারকারী এক ধরনের ইঞ্জিনের নাম ডিজেল ইঞ্জিন। রুডলফ্ ডিজেল (১৮৫৮-১৯১৩) এ ধরনের ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন বলেই এ ইঞ্জিনকে ডিজেল ইঞ্জিন বলা হয়। ডিজেল ইঞ্জিনও আসলে এক ধরনের অন্তর্দহন ইঞ্জিন। পেট্রোলের চেয়ে ডিজেল তেল দামে সস্তা। সাধারণত সাবমেরিন, জাহাজ, বাস, কল-কারখানা ইত্যাদিতে ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়।

উপরে সাধাণভাবে বিভিন্ন ইঞ্জিনের উদ্ভাবন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এ আলোচনাকে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সারাংশ মনে করা ঠিক নয়। তবে এ কথা ঠিক, ইঞ্জিন আবিষ্কার প্রযুক্তির ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রসায়নের রসযজ্ঞ

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে রসায়নবিদ্যার অবদান এতো বেশি যে, কোনো মুহূর্তেই আমরা রসায়নের প্রভাবের বাইরে যেতে পারি না। যে কালি দিয়ে আমরা লিখছি বা যে কাগজে আমরা লিখছি কিংবা যে খাবার আমরা খাই তার সবকিছুতেই রয়েছে এই রসায়নের কেরামতি। আর আধুনিক রসায়নবিদ্যার অগ্রগতি যে কি বিস্ময়কর, তা আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। এর ফলে আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে অসাধারণ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। আমাদের জীবনযাত্রা হয়েছে অনেকখানি সহজ। নিত্য নতুন অনেক উপকরণ ব্যবহার করতে পারছি আমরা।

কিন্তু রসায়নশাস্ত্রের এই অগ্রগতি মাত্র কয়েকটি দিন, কয়েকটি মাস অথবা কয়েক বছরের সম্ভব হয়নি। এর পেছনে রয়েছে বহু বিজ্ঞানীর বহু বছরের নিরলস সাধনা। প্রাচীনকালে রসানবিদ্যার সূচনা হয়েছিলো মূলত আলকেমীকে কেন্দ্র করে। তখন রসায়নবিদরা মনে করতেন, কম দামি ধাতুপিণ্ডকে রাসায়নিক উপায়ে অত্যন্ত মূল্যবান স্বর্ণপিণ্ডে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এই অসম্ভব সাধনের প্রয়াসে মেতেছিলেন সেদিনের কিমিয়াবিদরা। যদিও সাধারণ ধাতুপিণ্ডকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়নি, তবুও তাঁদের এই প্রয়াস কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি। সোনার হরিণের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে তাঁরা কিন্তু রসায়নের বিভিন্ন বিষয় আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন।

আধুনিক রসায়নের জনক

কিন্তু প্রাচীন রসায়নবিদদের এই সাধনা সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত রসায়নশাস্ত্র মূলত একটি বিশেষ বিজ্ঞান রূপে গড়ে ওঠেনি। আধুনিক কালেই আসলে যথার্থ ও সুষ্ঠুভাবে রসায়নশাস্ত্রের চর্চা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ফরাসী রসায়নবিদ লাভোয়াশিয়েই হচ্ছেন আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের জনক। ১৭৮৯ সালে তাঁর 'ট্রেইটে এলিমেন্টারী দ্য কিমি'

বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরই মূলত আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের সূচনা হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' এবং চার্লস ডারউইনের 'অরিজিন অফ স্পিসিজ'-এর যে ভূমিকা, তেমনি আধুনিক রসায়নবিদ্যায়ও লাভোয়াশিয়ে-এর গ্রন্থটির সেরূপ ভূমিকা রয়েছে। লাভোয়াশিয়েই প্রথম তাঁর এই গ্রন্থে রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাসমূহের ফলাফল সুচারুরূপে বিন্যস্ত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় পদার্থের ওজন ও অন্যান্য গুণের পরিবর্তন হয়।

লাভোয়াশিয়ে-এর জন্মের সময় অর্থাৎ ১৭৪৩ সালের দিকে গ্যাস নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিলো। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সকলের ধারণা ছিল যে, বায়ুই হচ্ছে একমাত্র গ্যাস এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই বায়ুই অংশগ্রহণ করে। কিন্তু ১৭৫৬ সালে জোসেক ব্লেক নামে একজন স্কটদেশীয় রসায়নবিদ 'কার্বন ডাই অক্সাইড' আবিষ্কার করে প্রথম এই ধারণা ভুল বলে প্রমাণ করেন। এদিকে একটি বদ্ধ বোতলের মধ্যে 'ফসফরাস' জ্বালিয়ে লাভোয়াশিয়ে প্রমাণ করলেন যে, দহনের সময় ফসফরাস বাতাস থেকে শক্তি আহরণ করে। এভাবে অনেক ক'টি পরীক্ষার পর লাভোয়াশিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের একটি বিবরণ প্রস্তুত করে তা ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমীতে জমা দেন। লাভোয়াসিয়ে তাঁর জীবনকালে ৫০টিরও অধিক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার অথবা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার হচ্ছে বস্তুর নিত্যতা সূত্র। ১৭৭৮ সালে ২৭ বছর বয়সে তিনি বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য নির্বাচিত হন। এর পর প্রায় পঁচিশ বছর ধরে তিনি এই একাডেমীর নিয়োজিত দু'শোটি কমিশনের সদস্যরূপে কাজ করেন। ফলে বিজ্ঞানের চর্চায় তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করতে ব্যর্থ হন।

অক্সিজেন ও প্রিস্টলী

এদিকে ইংল্যাণ্ডে জোসেফ প্রিস্টলীও তখন গ্যাস নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। জোসেফ প্রিস্টলীর জন্ম ১৭৩৩ সালে। অক্সিজেন বা অম্লজান গ্যাস আবিষ্কারের জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন বিজ্ঞানের ইতিহাসে। জোসেফ প্রিস্টলী ছিলেন মুক্তমনা এবং উদার। গীর্জার ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার প্রভৃতির সমালোচনায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। ইংল্যাণ্ডে ফরাসী বিপ্লবের পক্ষ সমর্থনকারীদের মধ্যে প্রিস্টলী ছিলেন অন্যতম। এসব কারণে ১৭৯১ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে এক উন্মত্ত জনতা তাঁর বাসগৃহ ও ল্যাবরেটরী

ধ্বংস করে দেয়। গোপনে সংবাদ পেয়ে তিনি মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে পালিয়ে গিয়ে আধমাইল দূরে তাঁর এক বন্ধুর বাসায় আত্মগোপন করে বেঁচে যান। ১৭৯৪ সালে প্রিস্টলী স্বদেশ ত্যাগ করে আমেরিকা চলে যান। ঐ একই বছর ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পক্ষ সমর্থনের অজুহাতে লাভোয়াশিয়ে গিলোটিনে প্রাণ হারান।

১৭৭৪ সালে ইউরোপ ভ্রমণের সময় প্রিস্টলী প্যারিসে লাভোয়াশিয়ে-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি বয়সে লাভোয়াশিয়ে থেকে দশ বছর বড় ছিলেন এবং ঐ সময় তাঁর পরিচিতিও ছিল অধিকতর ব্যাপক। এই সাক্ষাৎকারের সময় তাঁদের দু'জনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়।

হেনরী ক্যাভেণ্ডিশ

এই দু'জনের প্রায় সমসাময়িক আরেকজন রসায়নবিদ হচ্ছেন হেনরী ক্যাভেণ্ডিশ। ১৭৩১ সালে তাঁর জন্ম। তিনি বায়ুর মধ্যকার গ্যাস-সমূহ নিয়ে গবেষণা করেন এবং হাইড্রোজেন বা উদযান গ্যাস পৃথক করতে সক্ষম হন। ১৭৬৬ সালে তিনি তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেন। জন্মসূত্রে ক্যাভেণ্ডিশ প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। সারাজীবন তিনি বিজ্ঞান সাধনার মধ্যেই অতিবাহিত করেন। তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন এবং রসায়ন, তাপ, বিদ্যুৎ ও বলবিদ্যা বিষয়ে বহুকিছু আবিষ্কার করেন। তবে এর মধ্যে অনেক কিছুই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নোট বইতে পাওয়া যায়। হেনরী ক্যাভেণ্ডিস তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, পানি আসলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত। ১৮১০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

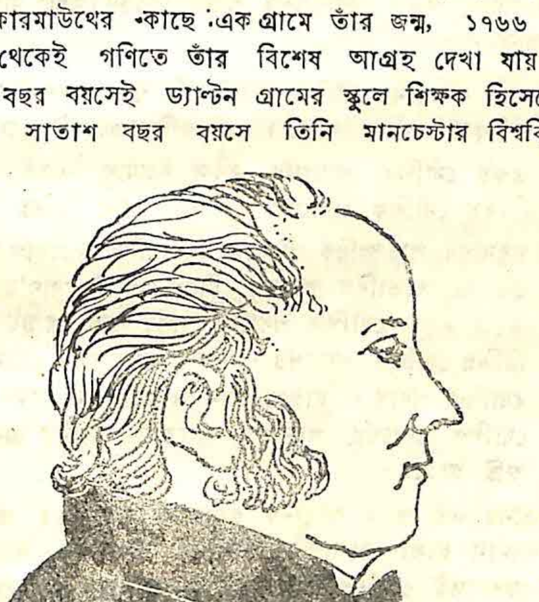
লাভোয়াশিয়ে, প্রিস্টলী এবং ক্যাভেণ্ডিশ—আধুনিক রাসায়নের এই তিন দিকপালের অবদান রসায়নের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। বিশেষত একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিষয় হিসেবে রসায়নের ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লাভোয়াশিয়ে উল্লেযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি চিন্তা করেন যে, রাসায়নিক পদার্থসমূহের নামের সাযুজ্য রক্ষা করা উচিত। এবং তিনি নিজেই অনেকগুলো পদার্থের নামকরণ করেন। এ সব নাম মূলত গ্রীক এবং ল্যাটিন শব্দ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছিল। লাভোয়াশিয়ে প্রবর্তিত এই নামকরণ প্রক্রিয়াই রসায়নচর্চায় এখনো পর্যন্ত বিশেষ-ভাবে অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

লাভোয়াশিয়ে-এর এই অবদানের কথা স্মরণ করতে গিয়ে আমরা তাঁর জীবনের করুণ পরিণতির কথাও ভুলতে পারি না। ফরাসী বিপ্লবের সময় বুর্জোয়াদের সমগোত্রীয় রূপে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে গিলোটিনে মৃত্যুবরণ করেন ১৭৯৪ সালে।

কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস, ফরাসীরাই পরে তাঁকে আধুনিক রসায়নের জনকের আসনে অভিষিক্ত করেন।

জন ড্যাল্টন

রসায়নের আরেকজন স্থপতি হচ্ছেন জন ড্যাল্টন। ইংল্যাণ্ডের কাম্বার-ল্যাণ্ডের ককারমাউথের কাছে এক গ্রামে তাঁর জন্ম, ১৭৬৬ সালে। ছেলেবেলা থেকেই গণিতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। আর মাত্র তেরো বছর বয়সেই ড্যাল্টন গ্রামের স্কুলে শিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। সাতাশ বছর বয়সে তিনি মানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে



গণিতের লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। তারপর থেকে চলতে থাকে তাঁর নিরলস বিজ্ঞানসাধনা। তাঁর কাছে ছোট্ট একটা সাধারণ যন্ত্র ছিল। সেটা দিয়েই শুরু করেন বিভিন্ন গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। গ্যাসের ওজন, আয়তন ইত্যাদির তুলনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ড্যালটন বুঝতে পারলেন, একটি গ্যাসের সঙ্গে আরেকটি গ্যাসের

মিলনে যে নতুন একটি গ্যাস অথবা পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাতে একটি বিশেষ নিয়ম কাজ করে।

ড্যাল্টনের সময়ে বিজ্ঞানীদের কাছে মাত্র তেইশটি রাসায়নিক এলিমেন্ট বা মৌলিক পদার্থের নাম জানা ছিল। রবার্ট বয়েল, আইজাক নিউটন ও অন্যরা ধারণা করেছিলেন যে, সব মৌলিক পদার্থই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এটম বা পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। শুধু পরমাণুর সংখ্যার কারণে মৌলিক পদার্থসমূহের এই ভিন্নতা। জন ড্যাল্টন তাঁর পরীক্ষায় দেখলেন যে, গ্যাসসমূহের পরস্পরের সাথে জোট বাঁধার একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এখান থেকেই জন ড্যাল্টন আবিষ্কার করলেন তাঁর রসায়নের পরমাণু-তত্ত্ব। ড্যাল্টনের পরমাণু-তত্ত্বের তিনটি প্রধান স্বীকার্য হচ্ছে, যথাক্রমে—

(১) প্রত্যেক ধরনের মৌলিক পদার্থ অতি সূক্ষ্ম, অখণ্ডনীয় এবং নিরেট কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। এই কণিকাগুলোই হচ্ছে পরমাণু।

(২) একই মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণু একই ওজনবিশিষ্ট। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন বিভিন্ন।

(৩) পরমাণুর পারস্পরিক মিলনে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক পরমাণু মিলে একটি 'অণু'র সৃষ্টি করে। একটি নতুন যৌগিক পদার্থের অণুর সৃষ্টি হয় দুই বা ততোধিক বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সংযোগে। যেমন পানি একটি যৌগিক পদার্থ। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুই প্রকার মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সংযোগে পানির এক-একটি অণু সৃষ্টি হয়েছে।

ড্যাল্টনের এই তত্ত্বই আধুনিক রসায়নের মেরুদণ্ড। তাঁর আরেকটি প্রধান অবদান হলো—রাসায়নিক চিহ্ন বা প্রতীকের ব্যবহার। তবে তাঁর জীবদ্দশাতেই সুইডিশ রসায়নবিদ বার্জেলিয়াস এই প্রতীক পরিবর্তন করেন। কিন্তু জৈব রসায়নে এখনো পর্যন্ত ড্যাল্টনের নিয়মই অনুসরণ করা হয় যৌগিক পদার্থ গঠনের প্রক্রিয়া বোঝানোর জন্যে।

ড্যাল্টন প্রায় ৫০ বছর ধরে তাঁর ডায়রীতে আবহাওয়ার বিভিন্ন বিষয় নোট করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁর দু'লাখ তথ্য পাওয়া গেছে, যা পরবর্তীকালে গবেষকদের কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ড্যাল্টন ১৮৪৪ সালে পরলোক গমন করেন।

বার্জেলিয়াস

ড্যাল্টনের পরমাণু-তত্ত্বকে যিনি প্রয়োগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যথার্থ রূপ দান করেছিলেন তিনি বার্জেলিয়াস। জন্ম তাঁর সুইডেনে, ১৭৭৯ সালে। রসায়নের সাথে বিদ্যুৎ-এর সম্পর্কের প্রশ্নটিও তিনিই প্রথম উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, দু'টি পদার্থ যখন পরস্পরের সাথে মিলিত হয় তখন তাদের মিলনের পেছনে বৈদ্যুতিক শক্তিও আংশিকভাবে কাজ করে। তিনি বলেন, যে দুটি রাসায়নিক পদার্থ মিলিত হবে তারা রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিকভাবে পরস্পর বিপরীত।

প্রথমে বর্জেলিয়াসের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন অনেকেই। কিন্তু পরে তাঁর বক্তব্যই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।

বার্জেলিয়াস তৎকালে জ্ঞাত ৫০টি রাসায়নিক মৌলের মধ্যে ৪৫টির পারমাণবিক ওজন বের করেন এবং ১৮১০ থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত দশ বছরের কঠোর পরিশ্রমে দু'হাজারের অধিক অজৈব রাসায়নিক যৌগ নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা সম্পাদন করেন। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন যে, অম্লজান নয়, বরং উদজান অর্থাৎ হাইড্রোজেনই সকল এসিডের মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বার্জেলিয়াসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে রাসায়নিক মৌলের চিহ্ন ব্যবহার। আমরা আজকাল বিভিন্ন রাসায়নিক মৌলের জন্য যে সব চিহ্ন ব্যবহার করি, বার্জেলিয়াসই তা প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি মৌলসমূহের ল্যাটিন নামের প্রথম এক বা দুই অক্ষর ঐ মৌলের রাসায়নিক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করার প্রস্তাব দেন। এভাবেই রাসায়নিক যৌগের রাসায়নিক সূত্র লেখার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। বলাবাহুল্য, রসায়নে বার্জেলিয়াসের এই অবদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ১৮৪৮ সালে ৬৯ বছর বয়সে বার্জেলিয়াস মৃত্যুবরণ করেন।

গে-লুসাক

সমসাময়িককালের আরেকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হচ্ছেন লুই গে-লুসাক। ১৭৭৮ সালে তাঁর জন্ম। বয়েল এবং চার্লস-এর উত্তরসূরি রূপে গে-লুসাক গ্যাস নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। গে-লুসাক বলেন যে, সব পরমাণুই সমান আয়তন অধিকার করে। এভাবেই তিনি প্রমাণ করেন যে, রাসায়নিক মিলনের ফলে অণু অথবা মোলিক্যুল-এর প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। গ্যাস-এর ব্যবহার সম্পর্কিত নিয়মটি 'গে-লুসাক সূত্র' নামে পরিচিত। ১৮৫০ সালে গে-লুসাক মৃত্যুবরণ করেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আছি মাটির কাছাকাছি

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত ছাড়াও এ-সময়ে বিজ্ঞানীরা অন্যান্য বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ দশক থেকে উনবিংশ শতকের প্রথম দুই দশক হচ্ছে ভূতত্ত্বচর্চার স্বর্ণযুগ। এ সময়েই ভূতত্ত্ববিদরা ভূতত্ত্বকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। পৃথিবীর গঠন, ফসিল ও নানা খনিজ পদার্থের সমাবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা ভূতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তৈরির পথ করলেন প্রশস্ত।

কিন্তু তার আগেই হয়তো প্রশ্ন উঠবে—ভূতত্ত্ব কি? অথবা তোমরা হয়তো জানতে চাইবে, ভূতত্ত্বের প্রয়োজনই বা কেন! পৃথিবীর ভূ-স্তরের গঠন, শিলার গঠন, নানা প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের বিষয় চর্চাই ভূতত্ত্ব। ভূতত্ত্ববিদরা তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ভূ-স্তর, শিলা ইত্যাদির গঠন নির্ণয় করেন এবং এ থেকে তাঁরা পৃথিবীর গঠন ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতিতে ভূতত্ত্বের দান অপরিসীম। বর্তমান সভ্যতায় একদিকে যেমন প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের ব্যবহার অনস্বীকার্য, তেমনি অন্যদিকে ভূতত্ত্বের চর্চার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে এমন বহু চমৎকার তথ্য জানতে পারি যা আমাদের জীবন-ধারণ ও নানা ধরনের কর্মপ্রচেষ্টার জন্য অপরিহার্য। তাই আমাদেরকে আজও প্রতিনিয়ত এই ভূতত্ত্বের দরজায় হাজির হতে হচ্ছে।

ফসিল

ভূতত্ত্বচর্চার শুরুতে ভূতত্ত্ববিদরা প্রথমে যে রহস্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন তার নাম ফসিল। ভূ-স্তরের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চাপা পড়ে থাকা গাছপালা অথবা জীবজন্তুর দেহই হচ্ছে ফসিল। গ্রীক আর রোমানরা মনে করতো, ফসিলগুলো সব সামুদ্রিক জন্তু, পলিমাটির নিচে চাপা পড়ে ছিল তারা। কিন্তু শুষ্ক মাটিতে অথবা এমনকি পাহাড়ে পাওয়া যেত

এসব ফসিল। সমুদ্রের এই ফসিল এখানে এলো কি করে, তার রহস্য গ্রীক আর রোমানরা কিন্তু সমাধান করতে পারে নি।

এ বিষয়ে প্রথম যিনি আলোকপাত করেছিলেন তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ইবনে সিনা। তিনি মনে করতেন, ফসিল হচ্ছে প্রকৃতির অসমাপ্ত কাজ।

পঞ্চদশ শতকে লিউনার্দো দ্য ভিঞ্চি খাল খনন করার সময় বহু সামুদ্রিক ফসিল পেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, উত্তর ইতালীর পর্বত-সমূহের স্থানে একসময় ছিল গভীর সমুদ্র।

এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে উত্তোলিত হল ফসিলের এই রহস্যের যবনিকা। এই প্রয়াসে প্রথম যাঁর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন তিনি হচ্ছেন ফ্রেবার্গ খনিজবিদ্যা একাডেমীর খনিজবিদ্যার অধ্যাপক এব্রাহাম গটলব ওয়ারনার। তাঁর জন্ম ১৭৪৯ সালে। তিনিই প্রথম বললেন, পৃথিবীর ভূ-স্তরের গঠনের মধ্যে রয়েছে চমৎকার এক শৃংখলা এবং এই স্তরসমূহের বিন্যাস যদি ব্যাহত না হয় তাহলে স্তরবিন্যাসের মধ্যেই ভূ-গঠনের যথাযথ পরিচয় পাওয়া যাবে। ওয়ারনার সারা জীবন ধরে বিভিন্ন স্থানের ভূ-গঠন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং এ থেকে তিনি উপনীত হন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে।

তাঁর পূর্বে ফ্রান্সের একজন ভূতত্ত্ববিদ এ নিয়ে কিছু আলোকপাত করেন। ইনি জঁা এতিয়েনে গেটার্ড। জন্ম তাঁর ১৭১৫ সালে। মধ্য ফ্রান্সে তিনি ব্যাসল্ট-এর সত্যিকারের উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করেন। নিকোলাস দেসমারেস্ত (১৭২৫-১৮১৫) ছিলেন তাঁর উত্তরসূরি। তাঁরা প্রধানত আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা শিলারাশি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে-ছিলেন।

জেমস হাটন

এদিকে একই সময়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিলেন স্কটল্যাণ্ডের জেমস হাটন। ১৭২৬ সালে জন্ম তাঁর। হাটনকে প্রধানত ভূতত্ত্বের জনক বলা হয়, কেননা ভূতত্ত্বে প্রথম মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কৃতিত্বের দাবিদার তিনিই। ফ্রান্স এবং জার্মানীতে ভূতত্ত্ববিদরা যখন শিলারাশির নানা বিতর্ক নিয়ে ব্যস্ত, হাটন তখন স্কটল্যাণ্ড ও এডিন-বার্গের সমুদ্র-উপকূল ও নদীযুক্ত সংকীর্ণ বন্য উপত্যকায় খুঁজে বেড়া-চ্ছিলেন ভূ-গঠনের অভ্রান্ত উপাদান। হাটন বললেন, প্রাকৃতিক প্রক্রি-য়ায় পাহাড় ক্ষয় হয়, বিভিন্ন শিলা ক্ষয় হয়—আর নদীবাহিত হয়ে তা পলিরূপে সঞ্চিত হয়। এভাবেই ক্রমাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে

রূপান্তরিত হচ্ছে ভূ-স্তর। আবার অন্যদিকে এভাবেই নতুন ভূ-স্তর হচ্ছে গঠিত। উপত্যকার গঠন সম্পর্কেও হাটন একথা বলেন। কিন্তু হাটনের এই মতবাদ অবশ্য খুব বেশি লোককে আকর্ষণ করতে পারেনি। পৃথিবীর পরিবর্তন সম্পর্কে হাটনের মতবাদ বিশ্বাস করলেও রবার্ট লায়েল এবং ডারুইন হাটনের উপত্যকার গঠন সংক্রান্ত মতবাদ সমর্থন করেন নি। তাঁদের বক্তব্য ছিল, ভূমিকম্প অথবা ভূ-সংকোচনের ফলেই উপত্যকাসমূহের সৃষ্টি হয়।

১৭৮৫ সালে হাটন রয়েল সোসাইটি অব এডিনবার্গ-এর এক সভায় ভাষণ দেন। ১৭৯৫ সালে তাঁর বই 'থিওরী অব দি আর্থ, উইথ প্রুফস অ্যাণ্ড ইলাস্ট্রেশনস' প্রকাশিত হয়।

উইলিয়াম স্মিথ

এ সময়কার আরেকজন প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ হচ্ছেন উইলিয়াম স্মিথ। উইলিয়াম স্মিথ পেশায় ছিলেন একজন প্রকৌশলী ও জরীপকারী। ১৭৬৯ সালে তাঁর জন্ম। যৌবনে তিনি সমারসেট কোল ক্যানাল নির্মাণের কাজ তদারক করতেন এবং পরে চাকরির খাতিরেই প্রায় সারা ইংল্যাণ্ড ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এমন কি তখন তিনি বছরে প্রায় দশ হাজার মাইল পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতেন। আর যেখানেই তিনি যেতেন, সেখানেই তিনি ভূতাত্ত্বিক কাঠামোর নোট নিতেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, বিশেষ ধরনের ফসিল শুধুমাত্র বিশেষ ধরনের ভূ-স্তরেই পাওয়া যায়।

উইলিয়াম স্মিথ তাঁর সারাজীবনই ব্যয় করেছেন ভূতত্ত্বের চর্চায়। বেতনের অধিকাংশ অথবা প্রায় সবটাই খরচ হতো তাঁর ভূতাত্ত্বিক গবেষণার কাজে। ১৮১৫ সালে তিনি নিজ হাতে ইংল্যাণ্ডের একটি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রস্তুত করেন। ১৮৩১ সালে তিনি জিওলজিক্যাল সোসাইটি থেকে প্রথম ওয়ালাস্টন পদক পান এবং সোসাইটির প্রেসিডেন্ট তাঁকে 'ইংলিশ জিওলজির জনক' বলে অভিহিত করেন।

জর্জ ক্যুভিয়ের

স্মিথ যে সময় ইংল্যাণ্ডে ভূ-গঠনের ওপর কাজ করছিলেন, সেই একই সময় ফ্রান্সে একই বিষয়ের ওপর কাজ করছিলেন ক্যুভিয়ে এবং ব্রঁনিয়ার্ত। তাঁরা ভূ-স্তরের সুবিন্যস্ত তালিকা প্রস্তুত করেন এবং স্তর অনুযায়ী ফসিলের পরিচিতি চিহ্নিত করেন। চার বছর ধরে ক্যুভিয়ের

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই প্যারিসের চারদিকে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন ভূতাত্ত্বিক গঠন পর্যবেক্ষণের জন্য।

জর্জ ক্যুভিয়ের-এর জন্ম ১৭৬৯ সালে। ফ্রান্সে তাঁর জন্ম, কিন্তু তিনি লেখাপড়া করেন জর্মানীতে। ২০ বছর বয়সে তিনি প্যারিসে উদ্ভিদবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ক্যুভিয়ের জীবজন্তুর শারীরিক গঠন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। তিনি জীবজন্তুর হাড় সম্পর্কে এত অভিজ্ঞ হয়ে উঠলেন যে, যে কোন হাড় দেখলেই তিনি বলে দিতে পারতেন অই হাড়টি কোন জন্তুর এবং তা কোন জায়গার। পরে তিনি প্যারিস কলেজের ন্যাচারাল হিস্ট্রির অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ক্যুভিয়ের বহু ধরনের ফসিল, হাড় প্রভৃতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তবে ক্যুভিয়ের মনে করতেন যে, এক ধরনের জন্তু ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং জীবজগতে কোনো বিবর্তন ঘটে না। তিনি ফসিল ইত্যাদির সাহায্যে ভূ-স্তরের গঠন ও সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

চার্লস লায়েল

এর পরে ভূতত্ত্বের চর্চায় যাঁর নাম আসে তিনি চার্লস লায়েল। হাটন যে বছর মারা যান সে বছর অর্থাৎ ১৭৯৭ সালে লায়েলের জন্ম হয়। ভূতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি কোনো মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নি, কিন্তু তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর 'প্রিন্সিপলস অব জিওলজি' গ্রন্থটি ছিল ভূতত্ত্বের উপর সবচেয়ে বিখ্যাত বই। ১৮৩০ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে এই বইয়ের তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। লায়েল এই গ্রন্থে হাটনের মত সমর্থন করে বলেন যে, পৃথিবীর পরিবর্তন হয়েছে ধীরে ধীরে এবং বর্তমানের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করে অতীতের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এটা ছিল বিবর্তনবাদের শুরু, এবং অচিরেই ল্যামার্ক ও ডারুইন বিবর্তনবাদের সপক্ষে তাঁদের শাণিত যুক্তি নিয়ে এগিয়ে আসেন। বিশ্ববিজ্ঞানে শুরু হলো আরেকটি নতুন অধ্যায়।

ভূতত্ত্ব বিষয়ে উনিশ শতকে যে জ্ঞান অর্জিত হলো তা এই শতকের বিজ্ঞানচর্চাকে করলো গভীরভাবে প্রভাবিত। এবং এই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হলো যে, মাত্র পাঁচ হাজার বছর আগে নয়, বরং কোটি কোটি বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে এই পৃথিবী, সেখানে প্রাণের স্পন্দন মাত্র সেদিনের ঘটনা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিদ্যুতের জগত

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিজ্ঞানচর্চায় একটু ভাটা পড়েছিল। ইংল্যাণ্ডে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ হয়ে এসেছিল স্তিমিত। রয়েল সোসাইটির কার্যকলাপেও তেমন তোড়-জোড় আর ছিলনা।

এই শতাব্দীতে কিন্তু রসায়নের ক্ষেত্রে ঘটেছিল কিছু যুগান্তকারী আবিষ্কার। আধুনিক রসায়নের সূত্রপাতও হয় এ সময়েই। রসায়ন-বিদ্যার পথিকৃৎ ছিলেন জোসেফ ব্লেক, জোসেফ প্রিষ্টলি, হেনরি ক্যাভেণ্ডিশ এবং লাভোয়াসিয়ে। কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে ভূতত্ত্বের জগতে। এ শতকেই জেমস হাটন ভূতত্ত্বের মৌলিক ভিত্তি নির্মাণ করলেন। ভূতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণায় হলো বিরাট অগ্রগতি।

কিন্তু গ্যালভানি এবং ভোল্টার কাজের বিবরণ না দিলে সম্ভবত এ শতকের বিজ্ঞানচর্চর আসল দিকটির কথাই বাদ পড়ে যায়। গ্যাল-ভানি এবং ভোল্টা দু'জনেই বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করেছেন। আধুনিক জগতে বিদ্যুতের প্রয়োজন এবং ভূমিকা কি তা নতুন করে বলার প্রয়োজন হয়না অবশ্য। আধুনিক বিজ্ঞান যেমন বিদ্যুতের ওপর বহু-লাংশে নির্ভরশীল তেমনি আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিই আজ বিদ্যুৎ। এমনকি মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণের ওপর হিসাব করা হয় কোন দেশ কতটা উন্নত। সেই বিদ্যুতের কাহিনী বলতে গেলে গ্যাল-ভানি এবং ভোল্টার নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়।

লুইগি গ্যালভানি ঃ আলেসান্দ্রো ভোল্টা

লুইগি গ্যালভানির জন্ম ১৭৩৭ সালে। পেশায় ছিলেন তিনি বোলো-গনায় এনাটমির অধ্যাপক। একটি মরা ব্যাঙ নিয়ে কাজ করার সময়, ১৭৮০ সালে, তিনি দেখলেন যে দু'টি ভিন্ন ধরনের ধাতুর তৈরি তার

দিয়ে ব্যাঙটিকে স্পর্শ করতেই ব্যাঙের পা নড়ে উঠলো। তাঁর ধারণা ছিল এটা আসলে ব্যঙের দেহের কোনো ব্যাপার এবং ব্যাঙের পা থেকেই এই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। তাঁর এ ধারণার পেছনে যুক্তি ছিল, কেননা টর্পেডো মাছের ক্ষেত্রে তাঁরা দেখেছেন এই মাছ বৈদ্যুতিক শক দেয়।



কিন্তু আসল ব্যাপারটি তা ছিল না, তা জানা গেলো পরে। ভোল্টা পরে দেখান যে, আসলে দু'টি ভিন্ন ধাতুর সংযোগের কারণেই এই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আমরা প্রায় প্রতিদিনই ভোল্টার নাম স্মরণ করি। আর তা অক্ষয় হয়ে আছে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে 'ভোল্ট' পরিমাপ হিসেবে। আলেসান্দ্রো ভোল্টা ১৭৪৬ সালে উত্তর ইতালীর কোমোয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। গ্যালভানির পর তিনি দেখলেন যে, যদি দু'টি ভিন্ন ধাতু একটি তার দিয়ে সংযোগ করা হয় এবং ধাতুদ্বয়ের মাথা দু'টি তরল এসিডে ডুবিয়ে রাখা হয় তবে ঐ সংযোগকারী তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এই বিদ্যুতের পরিমাণ অতি সামান্য। কিন্তু তামা এবং দস্তা দিয়ে পরীক্ষা করে তিনি বেশ ভালো ফল পেলেন। এটাকে 'ভোল্টার বিদ্যুৎ-কোষ' বলা হয়। পরে তিনি এই বিদ্যুৎ-কোষকে আরো উন্নত করতে সক্ষম হন। ১৭৯৮ সালে গ্যালভানি এবং ১৮২৭ সালে ভোল্টা মৃত্যুবরণ করেন। প্রথমে গ্যালভানি এবং পরে ভোল্টা যে বিদ্যুতের আবিষ্কার করেছিলেন, সে

বিদ্যুৎ বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি করে এবং অনেকেই এ নিয়ে আরো গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। ভোল্টাই প্রথম রাসায়নিক



উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি আবিষ্কার করেন। আমরা আজকাল মোটরগাড়ি, টর্চলাইট, ট্রানজিস্টার ইত্যাদিতে যে ব্যাটারী ব্যবহার করি তাতে এই রাসায়নিক উপায়েই বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন

বিদ্যুৎ-প্রসঙ্গে আর একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর কথা আমাদের স্মরণ করতে হয়, যিনি বিজ্ঞানচর্চা ছাড়াও অন্যভাবে বিশ্বে পরিচিত হয়ে আছেন। ইনি বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন। জন্ম তাঁর ১৭০৬ সালে, আমেরিকার বোস্টন শহরে। তিনি ছিলেন একজন সাবান ও মোমবাতি ব্যবসায়ীর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। আট বছর বয়সে ফ্রাংকলিন স্কুলে যাওয়া শুরু করেন। কিন্তু দশ বছর বয়সেই পিতা তাঁকে স্কুল ছাড়িয়ে দোকানের কাজে লাগিয়ে দেন।

এ কাজ তাঁর ভাল লাগতো না। বড় ভাই ছাপাখানা চালাতেন। ফ্রাংকলিন ঝুঁকে পড়লেন সেদিকেই। এর মাঝে পেনসিলভেনিয়ার গভর্নর তাঁকে ছাপাখানার জিনসপত্র কেনার জন্য ইংল্যাণ্ডে পাঠালেন। কিন্তু তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য যে চিঠি পাঠানোর কথা ছিল

তা পাঠানো হলো না। দেড় বছর সেখানে অতিকষ্টে কাটানোর পর ফ্রাংকলিন আবার দেশে ফিরে আসেন এবং একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে



শুরু করেন ও একটি বইয়ের দোকান দেন। কিন্তু এত কাজের ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি বিদ্যুতের গবেষণা নিয়ে উৎসাহ দেখাতে লাগলেন। লেইডেন জার এবং ইলেকট্রিক মেশিন নিয়ে তিনি নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চললেন। এই সময়ে তিনি আমেরিকান ফিলসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। আজ পর্যন্ত এই সোসাইটি বিশ্বের অন্যতম অগ্রগণ্য বিজ্ঞান সমিতি হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। ফ্রাংকলিন বলেন যে, বজ্রপাত আসলে একটি বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ। এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি বজ্রপাতের সময় একটি ঘুড়ি উড়িয়ে দেন। তাঁর এ পরীক্ষার সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটে এবং রিকমান নামে একজন লোক এই দুর্ঘটনায় মারা যান।

বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন বেশ কয়েকবার ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ করেন। ১৭৫২ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ব্যক্তিগত জীবনেও ফ্রাংকলিন-এর সাফল্য অসামান্য। আমেরিকার ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে আমেরিকার সংবিধানের অন্যতম রচয়িতা হিসেবে। ১৭৯০ সালে ফ্রাংকলিনের মৃত্যু হয়। তখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিতান্ত প্রাথমিক স্তরেই ছিল সীমাবদ্ধ।

লিনিয়াস

গ্যালভানি, ভোল্টা ও ফ্রংকলিন প্রমুখের দ্বারা যখন বিদ্যুৎ-শক্তির ভিত্তি তৈরি হচ্ছিলো, তখন জীববিদ্যার ক্ষেত্রেও আবির্ভাব ঘটেছিলো অনেক প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর। তাই বিদ্যুৎ সম্পর্কে আরো ব্যাপক আলোচনার পূর্বে সমসাময়িক কালের কয়েকজন জীববিজ্ঞানীর কাজ সম্পর্কে জানা দরকার। এঁদের মধ্যে সবার আগে যাঁর নাম আসে তিনি কার্ল লিনিয়াস। উদ্ভিদবিদ্যার জনকের সম্মান দেওয়া হয় তাঁকে। তাঁর আসল নাম কার্ল ফন লিন। ল্যাটিনে তাঁর নাম লিনিয়াস। এই স্যুইডিশ বিজ্ঞানীর জন্ম ১৭০৭ সালে। ভাইবোনদের মধ্যে লিনিয়াস ছিলেন সবার বড়। তাঁর বাবা ছিলেন ধর্মযাজক। ছেলেবেলা থেকেই পোকা-মাকড় ও গাছপালা সংগ্রহ করার খুব ঝোঁক ছিল তাঁর। প্রথমে সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে হল্যাণ্ডে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন তিনি। এরপর সুইডেনে ফিরে শুরু করেন ডাক্তারী। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করার উৎসাহে তখনো তাঁর ভাটা পড়েনি একটুও। ১৭৪১ সালে তিনি উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেন গড়ে তোলার ভার নেন। ১৭৭৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

লিনিয়াসের অক্ষয় কীর্তি হচ্ছে জীবজগতের শ্রেণীবিভাগ। জীববিজ্ঞান অধ্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁর এই শ্রেণীবিভাগ এক নতুন যুগের সূচনা করে এবং এর ফলে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা সম্ভব হয়। প্রথমে তিনি সমগ্র জীবজগতকে দুটি ভাগে ভাগ করেন—প্রাণী রাজ্য ও উদ্ভিদ রাজ্য। এবার প্রতিটি রাজ্যকে কতগুলি 'পর্ব' (ফাইলাম) ও 'শ্রেণী'তে (ক্লাস) এবং 'শ্রেণী'কে 'বর্গে' (অর্ডার), 'বর্গ'কে 'গোত্রে' (ফ্যামিলি), 'গোত্র'কে 'গণে' (জেনাস) ও 'গণ'কে 'প্রজাতি'তে (স্পিসিস) ভাগ করা হয়। লিনিয়াস ১৭৫৩ সালে উদ্ভিদের এবং ১৭৫৮ সালে প্রাণীর শ্রেণীবিভাজনের কাজ শেষ করেন। পরবর্তীকালে জীববিদ্যার আরো অগ্রগতি ঘটলে লিনিয়াসের শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু শ্রেণীবিভাগের মাধ্যমে তিনি উদ্ভিদ বা প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামকরণের যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন তা আজও জীববিজ্ঞানে অনুসরণ করা হয়। তাঁর এই রীতি অনুসারে প্রতিটি জীবেরই দুটি করে নাম থাকবে—প্রথমটি 'গণে'র এবং পরেরটি 'প্রজাতি'র নাম। লিনিয়াসের রীতি অনুসারে জীবজগতে মানুষের স্থান এভাবে নির্ধারণ করা যায়:

মানুষ

রাজ্য : প্রাণী রাজ্য (অ্যানিম্যালিয়া)
অঙ্গরাজ্য : মেটাজোয়া (বহুকোষী প্রাণী)
পর্ব : কর্ডাটা (যাদের নটোকর্ড ও স্নায়ুরজ্জু আছে)
উপপর্ব : ভার্টিব্রেটা বা মেরুদণ্ডী (যাদের মেরুদণ্ড ও কঙ্কালতন্ত্র আছে)
শ্রেণী : ম্যামালিয়া বা স্তন্যপায়ী
বর্গ : প্রাইমেট (চারটি অঙ্গপ্রতঙ্গ অর্থাৎ হাত-পা বা শুধুই পা। প্রত্যেকটিতে পাঁচটি করে আঙ্গুল)
গণ : হোমো (মানুষ)
প্রজাতি : স্যাপিয়েন্স (বুদ্ধিমান)

জীববিজ্ঞানসম্মত নাম : হোমো স্যাপিয়েন্স।

লেমার্ক

লিনিয়াসের পর জীববিদ্যার চর্চায় অন্যতম প্রধান পুরুষ হচ্ছেন জাঁ ব্যাপটিস্ট লেমার্ক। এই ফরাসী বিজ্ঞানীর জন্ম ১৭৪৪ সালে। পিকার্ডের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। পড়াশোনা করেন তিনি অ্যামিয়েনস-এর জেসুইট কলেজে। কথা ছিল, চার্চের কাজে যোগদান করবেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে হলো অন্যরকম। কিছুকাল সেনাবাহিনীতে চাকরি, তারপর ব্যবসা এবং অবশেষে ১৭৮২ সালে প্যারিসে 'কিংস গার্ডেনে' উদ্ভিদবিদ-এর চাকরি। এখানেই উদ্ভিদবিজ্ঞানের সাথে তাঁর ব্যাপক পরিচয় ঘটে। ফরাসী বিপ্লবের সময় ১৭৯০-১৭৯৩ সাল পর্যন্ত বাগানগুলো বন্ধ রাখা হয়। এ সময় লেমার্ক উদ্যানসমূহের সংস্কারের প্রস্তাব করে কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন। ১৭৯৪ সালে জাতীয় সম্মেলনে তাঁর অনেকগুলো প্রস্তাব গৃহীত হয়। লেমার্ক তখন অমেরুদণ্ডী প্রাণীবিজ্ঞানের প্রধান নিযুক্ত হন। ১৮০৯ সালে তাঁর 'জুলজিক্যাল ফিলসফি' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

লেমার্ক জীববিজ্ঞানে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনিই প্রথম জীববিজ্ঞানে বিবর্তনবাদের ধারণার কথা প্রচার করেন। অবশ্য পরে বিজ্ঞানী চার্লস ডারুইনের দ্বারাই এই ধারণা বিবর্তনতত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৯ সালে লেমার্কের মৃত্যু হয়।

ইরেসমাস ডারুইন

লেমার্কের সহগামী হয়ে এলেন ইরেসমাস ডারুইন। ইরেসমাস ডারুইন ছিলেন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী চার্লস ডারুইনের পিতামহ। তাঁর জন্ম ১৭৩১ এবং মৃত্যু ১৮০২ সালে। ইংল্যাণ্ডের এলস্টন তাঁর জন্মভূমি। পিতা রবার্ট ডারুইন ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। ইরেসমাসের অগ্রজ ওয়েরিং ছিলেন কবি, বিজ্ঞানী এবং 'প্রিন্সিপিয়া বোটানিকা'র লেখক।

ইরেসমাসের উচ্চশিক্ষার সময় তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তবুও অনেক কষ্ট করে তিনি তাঁর উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৭৫৪ সালে গণিত ও ক্লাসিক সহ তিনি কেমব্রিজের সেন্ট জোন্‌স কলেজ থেকে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরে এডিনবরা থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রী লাভ করেন।

চিকিৎসক হিসেবে ইরেসমাস খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থ—সবই অর্জন করেছিলেন। কিন্তু শুধু এতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন দার্শনিক, জীববিজ্ঞানী, বিবর্তনতত্ত্ববিদ ও সমাজকর্মী।

'অরিজিন অব স্পিসিজে'র প্রায় ষাট বছর পূর্বে ইরেসমাসের বিখ্যাত গ্রন্থ 'জুনমিয়া' প্রকাশিত হয়। সেকালে এই গ্রন্থটি ছিল একটি অসাধারণ গ্রন্থ।

ইরেসমাস তাঁর সমকালীন বহু প্রখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে নানা সূত্রে জড়িত ছিলেন। আধুনিক ভূবিদ্যার জনক জেমস হাটন এবং বিখ্যাত ফরাসী চিন্তাবিদ রুশোর সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।

সারাজীবন ইরেসমাস অখণ্ড মনোযোগের সাথে লেখাপড়ার কাজ করেছেন। বলা যায়, যেন গভীর সাধনায় তিনি থকেতেন আত্মমগ্ন। আর ছিল তাঁর ভ্রমণের দারুণ নেশা। তাঁর যাত্রা শুরু হতো ঘোড়ার গাড়িতে আর শেষ হতো পদব্রজে।

১৮০২ সালে, তাঁর পৌত্র জগদ্বিখ্যাত বিবর্তনবিদ ও বিজ্ঞানী চার্লস ডারুইনের জন্মের সাত বছর আগে, ব্রেডসলে ইরেসমাসের মৃত্যু হয়।

চার্লস ডারুইন

'আমার জন্ম শ্রুয়েসবেরীতে, ১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী। আমার মার মৃত্যু ১৮১৭ সালের জুলাই মাসে। আমার বয়স তখন আট বছরের একটু বেশি। তাঁর শেষ শয্যা, কাল ভেলভেট গাউন এবং অদ্ভুত আকারের টেবিল ছাড়া মা সম্পর্কে আর কিছুই আমি মনে করতে

পারি না। বসন্তেই আমি শ্রুয়েসবেরীর স্কুলে ভর্তি হলাম। সবাই বলতেন আমার বোন অপেক্ষা পড়াশোনায় আমি অনেক খারাপ ছিলাম। আমার মনে হয় আমি বোধ হয় দুষ্টু বখাটে ছিলাম। এ বয়সেই প্রকৃতি-বিদ্যা এবং সংগ্রহে আমার নেশা ধরেছিল। গাছের নাম জানা ছাড়াও সব রকমের খোলক, মুদ্রা ও খনিজ পদার্থ সংগ্রহে আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল, কিন্তু আমি কখনই বাসা থেকে একটির বেশি ডিম নিতাম না। আমার মাছ ধরারও নেশা ছিল। আমি নদী অথবা পুকুরে ছিপ ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম।



'১৮১৮ সালের গ্রীষ্মে আমি ডঃ বাটবালের স্কুলে ভর্তি হই। এখানেই আমি সাত বছর পড়াশোনা করেছি। আমি হোস্টেলে থাকতাম। কিন্তু একটু সময় পেলেই ছুটে আসতাম বাড়িতে। পথে চলার সময় আমি হঠাৎ অন্যতর ভাবনায় কখনও ডুবে যেতাম।

'এ স্কুলের পাঠ শেষ হলে সকলেই নিশ্চিত হলেন যে আমার মেধা সাধারণের চেয়ে নিম্নমানের। বাবা আমার মনে গভীর আঘাত দিয়ে বললেন: সারাদিন শিকার, কুকুর, ইঁদুর ধরা ছাড়া আর কিছুতেই তোমার মন নেই, তুমি নিজের কাজে, পরিবারের কাছে শেষ অবধি লজ্জার কারণ হবে। আমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং তাঁর স্মৃতি আমার মনে ভালবাসার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। তিনি আমার প্রতি এ সময় যে রূঢ় অভিযোগ করেছিলেন তার কারণ তখন সম্ভবত তিনি হঠাৎ খুব বেশি রেগে গিয়েছিলেন।

'শৈশব স্মৃতি থেকে আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যেটুকু ইঙ্গিত আমি আজ সংগ্রহ করতে পারি, তা বিচিত্র বিষয়ে আমার প্রবল আকর্ষণ, পছন্দ বিষয়ের প্রতি অকুণ্ঠ নিষ্ঠা এবং দুর্বোধ্যের মর্মোদ্ধারে গভীর আনন্দ।...স্কুল জীবনের শুরুতেই আমি ওয়াণ্ডার্স অব দি ওয়ার্ল্ড পড়ি এবং এ থেকেই আমার মনে বিশ্বভ্রমণের প্রবল আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটে। ১৮১৯ সালে আমি প্রথম ওয়েলস-এর সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে যাই। সেখানে সিঁদুরলাল পতংগসমূহ, নানা জাতের মথ দেখে আমি গভীর কৌতূহল অনুভব করি। এ সময়ে পাখির প্রতিও আমি গভীর-ভাবে আকৃষ্ট হই এবং কেন প্রত্যেকেই পক্ষীবিশারদ হয় না এ নিয়ে আমার ভাবনার শেষ ছিল না।'

এ অংশটুকু প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিবর্তনবাদের জনক বলে পরিচিত জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারুইন-এর আত্মজীবনীর অংশ। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি ছেলেবেলায় ডারুইন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সাথে নিজেকে বিশেষ খাপ খাওয়াতে পারেন নি। ফলে এ ছেলেকে দিয়ে কিছুই হবে না এরকম একটি ধারণা তাঁর সম্পর্কে গড়ে উঠেছিলো সবার।

স্কুলে ডারুইনের আগ্রহ কম দেখে তাঁর বাবা তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসেন। পরে ১৮২৫ সালে তাঁকে পাঠানো হলো এডিনবার্গে চিকিৎসা-বিদ্যা শেখার জন্যে। কিন্তু এটাও তাঁর ভালো লাগলো না। আর একদিন একটি শিশুর অস্ত্রোপচার দেখে পালিয়ে গেলেন তিনি।

এতএব এবার পাঠ শুরু হলো যাজক হওয়ার জন্যে, কেমব্রিজে। ১৮২৮ সালে ডারুইন কেমব্রিজে এলেন। এখানেই অধ্যাপক হেনশ্লো উদ্ভিদবিদ্যা পড়াতেন। আর তাঁর ক্লাশটির প্রতি দারুণ আগ্রহ জন্মালো ডারুইনের। অতএব হেনশ্লোর উদ্ভিদবিদ্যার বক্তৃতা কোনোদিন বাদ গেলো না। মাঝে মাঝে ডারুইন হেনশ্লোর সঙ্গে দীর্ঘ ভ্রমণে বের হতেন। হেনশ্লোর অনুরোধেই সেজউইক উত্তর ওয়েলস পরিক্রমায় ডারুইনকে তাঁর সঙ্গে নেন।

এবার ডারুইন-এর নিজের কথাতেই তাঁর জীবনের বিবরণ শোনা যাক। 'সেজউইকের সঙ্গে ভূতাত্ত্বিক পরিক্রমা শেষে বাড়ি ফিরে দেখি হেনশ্লো এক চিঠিতে আমাকে বিগল ভ্রমণে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে-ছেন। এ প্রস্তাবে আমার আগ্রহের অবধি ছিল না। কিন্তু বাবার মত হলোনা। শেষে আমার মামার চেষ্টায় আমি অনুমতি পেলাম। বিগল ছাড়লো ১৮৩১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর। বিগল ভ্রমণই আমার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা এবং আমার জীবন-নির্দেশিকা। এ থেকেই আমার মানসগঠন ও প্রশিক্ষণ পূর্ণতা লাভ করে। এ সময়ই প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার সঙ্গে আমার নৈকট্য গভীরতর হয় এবং

আমার নিরীক্ষণ-ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আমার সঙ্গে লায়েলের 'প্রিন্সিপ্যল অব জিওলজি' ছিল এবং আমি তা গভীর মনোবিবেশে পাঠ করি। এ বই নানা দিক থেকে আমার প্রভূত উপকারে এসেছিল। আমি যে সব জায়গায় গিয়েছি তার ভূতাত্ত্বিক নিরীক্ষার গুরুত্ব ছিল আমার কাছে সমধিক। তাছাড়া সবরকম প্রাণী সংগ্রহ, এদের বর্ণনা, সামুদ্রিক প্রজাতিসমূহের সাধারণ ব্যবচ্ছেদও আমার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছবি আঁকার অক্ষমতা এবং এ্যানাটমি সম্পর্কে সীমিত জ্ঞানের জন্য আমার স্তূপীকৃত পাণ্ডুলিপির প্রধান অংশ শেষ অবধি অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত হয়েছিল।

'১৮৩৬ সালের ২রা অক্টোবর আমি ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসি। হেনশ্লোর কাছে সংরক্ষিত আমার সংগৃহীত বস্তুসম্ভারের যথাযথ ব্যবস্থা করতে কয়েক মাস কেটে গেল। অতঃপর আমি আমার ভ্রমণকাহিনী রচনায় মনোনিবেশ করি। এ সময় আমি লণ্ডনের মার্লবো স্ট্রীটে থাকতাম এবং বিয়ের আগ অবধি দু'বছর এখানেই ছিলাম। এ দু'বছরে আমি আমার ভ্রমণকাহিনী শেষ করি, ভূতাত্ত্বিক সমিতির অধিবেশনে কয়েকটি নিবন্ধ পাঠ এবং ভ্রমণকালীন ভূতাত্ত্বিক নিরীক্ষা এবং প্রাণীজগৎ সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী রচনা সম্পূর্ণ করি। ১৮৩৭ সালের জুলাই মাসে 'অরিজিন অব স্পিসিজ' রচনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী গ্রহনা শুরু করি এবং পরবর্তী বিশ বছর অবধি তা অব্যাহত থাকে।' কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো বিগল জাহাজে ভ্রমণে যাওয়ার সময় বিগল-এর ক্যাপ্টেন কিন্তু ডারুইনের চেহারা এবং নাকের গড়ন দেখে প্রথমে মন্তব্য করেছিলেন যে ডারুইনের পক্ষে কখনো বিজ্ঞানী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ক্যাপ্টেন পরে তাঁর মত পাল্টান এবং বিগলে ডারুইনকে সঙ্গে নেন। ১৮৩১ সাল পর্যন্ত মোট পাঁচ বছর ডারুইন বিগল জাহাজটির সঙ্গে ছিলেন। এই পাঁচ বছর তিনি দক্ষিণ গোলার্ধে বিভিন্ন প্রজাতি, পোকা-মাকড় এবং উদ্ভিদ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও সংগ্রহ করেন। এসব সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ থেকেই তিনি উপনীত হন বিবর্তনবাদ-এর সিদ্ধান্তে। আর বিশ বছর ধরে লেখা তাঁর 'অরিজিন অব স্পিসিজ' গ্রন্থে বিভিন্ন তথ্য ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ডারুইন এই বিবর্তনবাদকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৪৪ সালের শুরুতে তাঁর 'আগ্নেয় দ্বীপ' এবং ১৮৪৫ সালে 'জার্নাল অব রিসার্চেস', ১৮৪৬ সালে 'দক্ষিণ আমেরিকার ভূতাত্ত্বিক নিরীক্ষা' প্রকাশিত হয়। ১৮৫৯ সালের নভেম্বরে সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অরিজিন অব স্পিসিজ' প্রকাশিত হয়। যেদিন এ

বইটি প্রকাশিত হয় সেদিনই প্রথম সংস্করণের সব কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। বারো বছরে এ বইটির ছ'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয় আর সর্বমোট ছাপা হয় চব্বিশ হাজার। প্রাকৃতিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিক জগৎ এবং আবহাওয়া ও অন্যান্য প্রজাতির সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয় সবাইকে। এরই নাম জীবন-সংগ্রাম, এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তন ঘটে প্রজাতির। মানুষেরও দৈহিক এবং মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে এমনি করে। বিজ্ঞানীরা এরই নাম দিয়েছেন বিবর্তনবাদ। আর এই সংগ্রামের মাধ্যমে উত্তরণকে তাঁরা নাম দিয়েছেন 'সারভাইভ্যাল অব দি ফিটেস্ট' বা যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন। অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকতে পারে সেই সব প্রজাতি যারা জীবনের প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারে। আর এই আলোকেই তিনি রচনা করেন তাঁর পরবর্তী বই 'দি ডিসেন্ট অব ম্যান'।

১৮৮১ সালের ১৯শে এপ্রিল প্রায় ৭৩ বছর বয়সে দীর্ঘ কর্মময় জীবনের অবসানে চার্লস রবার্ট ডারুইন প্রাণত্যাগ করেন। তাঁকে সমাহিত করা হলো রাজকীয় সম্মানে ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবিতে, নিউটন ও লায়েলের পাশে।

বিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ডারুইনের সহযাত্রী ছিলেন আলফ্রেড রবার্ট ওয়ালেস, চার্লস লায়েল, ডাল্টন হূকার এবং জুলিয়ান হাক্সলি। অন্যদিকে ডারুইনের পিতামহ ইরেসমাস ডারুইন ছিলেন এই বিবর্তনবাদের প্রথম প্রবক্তা।

আলফ্রেড রবার্ট ওয়ালেস

বিবর্তনবাদের কথা বলার সময় ডারুইনের সঙ্গে অন্য যে আর একজন বিজ্ঞানীর নাম সমভাবে উল্লেখ্য তিনি হলেন আলফ্রেড রবার্ট ওয়ালেস। ওয়ালেসের জন্ম ১৮২৩ সালে, ইংল্যাণ্ডে। ডারুইন যেমন দক্ষিণ আমেরিকার গ্যালপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে পাঁচ বছর ধরে উদ্ভিদ ও অন্যান্য নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন, ওয়ালেসও তেমনি মালয় দ্বীপপুঞ্জের আর্চিপ্যালাগো দ্বীপাঞ্চলে দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন জীবজন্তু পর্যবেক্ষণ ও নমুনা সংগ্রহ করে। ওয়ালেস দীর্ঘ আট বছরে এখানে মোট চৌদ্দ হাজার মাইল ভ্রমণ করেন। তাঁর সংগৃহীত নমুনার সংখ্যা হয়েছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজারেরও বেশি। মালয়েশিয়ার পর ওয়ালেস সংগ্রহ অভিযানে যান আমাজন উপত্যকায়। চার্লস ডারুইন বিগল ভ্রমণ থেকে ফিরে আসেন ১৮৩৬-এর শেষার্ধে। রবার্ট ওয়ালেসের আমাজন উপত্যকা পরিক্রমা শেষ হয় তার ষোল বছর পরে ১৮৫২

সালে। এর পর আবার তিনি সংগ্রহ-অভিযানে বেরিয়ে ১৮৫৪ সালে সিঙ্গাপুর পৌঁছেন। ডারুইন তখন ইংল্যাণ্ডের ডাউন গ্রামে প্রজাতির উৎস নিয়ে কাজ করছিলেন।

আমাজনের দুর্গম উপত্যকায় আদিম হিংস্র অরণ্যবাসীদের আশ্রয়ে চার বছর কাটিয়েছিলেন ওয়ালেস। তাঁর ভাই সেখানে প্রাণ হারান আর তিনি নিজেও প্রবল পীতজ্বরে আক্রান্ত হন। আর ফেরার পথে জাহাজ-ডুবি হয়ে তাঁর সমস্ত সংগ্রহ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

কিন্তু এ অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। 'পাম ট্রিজ অব আমাজন' এবং 'আমাজন ভ্রমণ কাহিনী' নামে দু'টি রচনা স্বদেশের সুধীসমাজে তাঁর পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

কিন্তু মালয়েশিয়া দ্বীপপুঞ্জে তাঁর সংগ্রহ অভিযান সার্থক হয়েছিল। এখানকার সংগ্রহ এবং অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি রচনা করেন তাঁর সেই বিখ্যাত নিবন্ধ 'অন দি টেনডেন্সি অব ভ্যারাইটিজ টু ডিপার্ট ইনডেফিনিটলি ফ্রম দি অরিজিন্যাল টাইপ'। এই নিবন্ধটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি হয় বিরাট আলোড়ন।

১৮৬২ সালে ওয়ালেস দেশে ফিরে আসেন। চার বছর পর তিনি বিয়ে করেন অ্যানি মিটেনকে। এরপর তিনি বাড়িতে শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন জীবন অতিবাহিত করেন আর অব্যাহত রাখেন তাঁর বিজ্ঞানচর্চা।

১৯১৩ সালের ৭ই ডিসেম্বর ব্রডস্টোনে তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। ওয়ালেস একানব্বই বছর বেঁচেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের শিল্পোন্নতির অত্যন্ত আদিম অবস্থায় তাঁর শৈশব কেটেছে। ইংল্যাণ্ডের প্রথম রেললাইন জরিপে তিনি ছিলেন অন্যতম শিক্ষানবীশ। পালের জাহাজে ভ্রমণ করেছেন তিনি আর শেষ জীবনে এরোপ্লেন পর্যন্ত দেখে গেছেন। দেখে গেছেন বিজ্ঞানের বিরাট বিপুল অগ্রগতি।

চার্লস লায়েল

ওয়ালেসের পর যাঁর নাম আসে তিনি চার্লস লায়েল। লায়েলের জন্ম স্কটল্যাণ্ড-এর কিনোর্ডিতে, ১৭৯৭ সালের ১৪ই নভেম্বর। তাঁর পিতা ছিলেন বিরাট জমিদারির মালিক। লায়েলের কৈশোর কেটেছে নিউ-ফরেস্টের সবুজ স্বপ্নিল ছায়ায়। লায়েলের যখন স্কুলে যাবার বয়স তখন তাঁর পিতা কনোর্ডি ছেড়ে এখানে জমিদারি কেনেন। ছুটির দিনে লায়েল ঘুরে বেড়াতেন বনে বনে, প্রজাপতি আর ফড়িং ধরতেন, ডিম খুঁজতেন পাখির বাসায় আর খড়কুটোর তৈরি পাখির বাসা দেখে অবাক হয়ে যেতেন।

লায়েল অক্সফোর্ডে আসেন ১৮১৬ সালে। ১৮১৮ সালে ক্লাসিক্সে অনার্সসহ বি. এ. পাস করে ভর্তি হন লিংকনস্ ইনে। উদ্দেশ্য, আইনজীবী হবেন। ১৮২৮ সালে আইন ব্যবসায়ে ইস্তফা দিয়ে চিরতরে নিজেকে যুক্ত করলেন ভূতত্ত্বের সঙ্গে। ইতোমধ্যে ভূতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, পরিচিত হয়ে উঠেছেন তিনি লণ্ডনের বিজ্ঞানী সমাজে। তিনি তখন জিওলজিক্যাল সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক।

এ সময় রডারিক মার্সিসনের সঙ্গে ভূতাত্ত্বিক অবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য তিনি ইউরোপ ভ্রমণে বের হন। এই সফরে তিনি দক্ষিণ ইতালী থেকে প্রচুর ফসিল সংগ্রহ করেন। তারপর লণ্ডনে ফিরলেন ১৮২৯-এর শেষে। পথে দেখা করলেন জেনেভায় বিখ্যাত তরুবিদ ডি ক্যানডলের সাথে এবং প্যারিসে বিশ্ববিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ক্যুভিয়েরের সঙ্গে।

১৮৩০-৩৩ সাল লায়েলের জীবনে স্মরণীয় সময়। এ সময় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রিন্সিপল অব জিওলজি'র প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। অতঃপর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভূতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

চার্লস লায়েলের প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে ভূতত্ত্বকে সমকালীন সংস্কার থেকে মুক্ত করা। ভূতত্ত্বে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৮৭৪-এর জুন মাসে এল. এল. ডি. উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৭৫-এর ২২শে ফেব্রুয়ারী তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ড্যাল্টন হূকার

যোশেফ ড্যাল্টন হূকারের জন্ম ১৮১৭ সালে। বয়সে তিনি ডারুইনের চেয়ে আট বছরের ছোট। শৈশব থেকেই প্রকৃতি আর গাছগাছড়ার প্রতি জন্মেছিল তাঁর প্রচুর আগ্রহ। তিনি লেখাপড়া করেন গ্লাসগোতে। গ্লাসগো মেডিকেল স্কুলে পড়ার সময় তাঁর হাতে আসে চার্লস ডারুইনের বিগল ভ্রমণের 'জার্নাল'-এর পাণ্ডুলিপি।

বইটি লায়েল পাঠিয়েছিলেন সমালোচনার জন্য ড্যাল্টন হূকারের পিতা জ্যাকসন হূকারকে। জ্যাকসন হূকার নিজেও ছিলেন নিসর্গী। কীটতত্ত্ব এবং পক্ষীতত্ত্ব চর্চায় জ্যাকসন হূকার ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। এ দিকে মেডিকেল স্কুলের পড়া শেষ করে ড্যাল্টন দক্ষিণ মেরু অভিযাত্রী এক জাহাজে চিকিৎসকের চাকরি পেলেন। এর আগেই তিনি ডারুইনের ভ্রমণ কাহিনী পড়া শেষ করেছেন। বইটি তাঁকে দারুণভাবে

মুগ্ধ করেছিল। একদিন আকস্মিকভাবে ডারুইনের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল তাঁর। ডারুইনের সঙ্গে এই সাক্ষাতের কথা সারাজীবন মনে রেখেছিলেন তিনি।

১৮৩৯ সালের মে মাসে 'এরিব্যাস' জাহাজে হুকারের যাত্রা শুরু হলো। যাত্রার আগের দিন 'জার্নালে'র ছাপানো কপি হাতে এসেছে তাঁর। সঙ্গে ছিল লায়েলের 'প্রিন্সিপল অব জিওলজি' বইটিও। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে তাঁরা গেলেন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ফকল্যাণ্ড, টিয়েরা-ডল-ফুয়েগো সহ অনেক দূর পর্যন্ত। চার বছর ধরে হুকার পর্যবেক্ষণ করলেন বহু উদ্ভিদ ও ভূ-স্তরের গঠন।

হুকার কিছুকাল এডিনবরায় অধ্যাপকের চাকরি করলেন। তারপর ব্রিটিশ ভারতে উদ্ভিদ সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে এলেন কলকাতায়, ১৮৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে।

এবার প্রায় দেড় লাখ উদ্ভিদ নমুনার বিপুল সংগ্রহ নিয়ে হুকার দেশে ফেরেন ১৮৫১ সালে। এরপর নানা সংগ্রহ অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন হুকার। ১৮৭৭ সালে গেলেন উত্তর আমেরিকায়। তার আগেই ১৮৬৫ সালে কিউ উদ্যানের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। ১৮৮৫ সালে উদ্যান থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নেয়ার পূর্বেই তিনি 'জেনোরা প্ল্যানটারাম' রচনা করেন। এটি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। তারপর লিখলেন 'ফ্লোরা অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া', সাত খণ্ডে।

অবশেষে ১৯১১ সালে পরিণত বয়সে শেষনিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। কিউ উদ্যানে পিতার পাশে সমাহিত করা হয় তাঁকে।

টমাস হাক্সলি

হাক্সলির জন্ম লণ্ডনের নিকটস্থ ইলিংএ, ১৮২৫ সালে। তাঁর পিতা ছিলেন ইলিং স্কুলের গরীব সহকারী শিক্ষক। দশ বছর বয়স থেকেই হাক্সলির জীবন-সংগ্রামের শুরু। অর্থাভাবে স্কুল ছেড়ে দিতে হলো, কিন্তু বই পড়া বন্ধ হলো না। তাঁর দু'বোনের বিয়ে হয়েছিল ডাক্তারের সাথে। তাঁদের সাহায্যেই প্রথম চাকরি পেলেন, ডাক্তারের সহকারী, ডাক অঞ্চলের দরিদ্রদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এক হাসপাতালে। এ সময় স্কুল অব সার্জনস-এ উদ্ভিদবিদ্যার এক প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে হাক্সলি পেলেন রৌপ্যপদক। তারপর তিনি চিয়ারিং ক্রশ হাতপাতালে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নের বৃত্তি পেলেন। এখানে এনাটমির অধ্যাপক হোয়ার্টন জোন্‌স্-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার সুযোগ পান হাক্সলি। এ সময়

চুলের গোড়ায় তিনি যে পর্দা আবিষ্কার করেন অদ্যাবধি তা স্বীকৃত। এম বি পরীক্ষায় লাভ করলেন তিনি স্বর্ণপদক। অতঃপর 'রেটলস্নেক' জাহাজে সার্জনের কাজ নিয়ে রওয়ানা হলেন অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে। দেশে ফিরে ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের সভায় পরিচিত হুকার, হারবার্ট স্পেন্সর এবং ডারুইনের সঙ্গে গবেষণা, প্রবন্ধ-পাঠ, আলোচনা, বিতর্ক— সবকিছুতেই যোগ দিলেন উৎসাহের সাথে। রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হলেন মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে, পরের বছর পেলেন রয়েল মেডেল, কিন্তু চাকরি নেই। অবশেষে ১৮৫৫ সালে সরকারি খনিবিদ্যা স্কুলে প্রত্নজীববিদ্যার অধ্যাপকের চাকরি পেলেন।

১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হলো তাঁর 'ম্যানস প্লেস ইন নেচার' গ্রন্থটি। গ্রন্থটি বিশেষভাবে সমাদৃত হলো সুধীসমাজে। ১৮৭০ সালের পর হাক্সলি ক্রমান্বয়ে ব্রিটিশ এসোসিয়েশন এবং জিওলজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। শেষে সভাপতি হলেন রয়েল সোসাইটির। ১৮৭৬ সালে তিনি আমেরিকায় আমন্ত্রিত হলেন হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারোদঘাটনের সময়। ১৮৮০ সালের মধ্যেই প্রকাশিত হলো তাঁর 'ভার্টিব্রেট এনাটমি' (১৮৭১), 'এলিমেন্টারি বায়োলজি' (১৮৭৫), ইন-ভার্টিব্রেট এনাটমি' (১৮৭৭), 'ফিজিওগ্রাফী' (১৮৭৭) প্রভৃতি বই আর এর মধ্যেই ব্রিটেনের শিক্ষাজগতে হয়ে উঠেছেন তিনি সুপরিচিত। মাধ্যমিক পর্যায়ে লিবারেল শিক্ষার জনকরূপে পরিচিত হলেন টমাস হাক্সলি।

ডারুইনের মৃত্যুর পর ডারুইন পদক দানের ব্যবস্থা হলে, যথাক্রমে ওয়ালেস এবং হুকারের পর হাক্সলি পেলেন তৃতীয় পদকটি।

১৮৯৫ সালের মার্চ মাসে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন হাক্সলি। তার-পর এ অসুখের সাথে দেখা দেয় আরো নানা উপসর্গ। অবস্থার অবনতি ঘটলো দ্রুত। অবশেষে ১৮৯৫ সালের ২৯শে জুন সন্ধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন হাক্সলি। শিশুপুত্র নোয়েলের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হলো ফিঞ্চলেতে।

হুমবোল্ট

জীববিজ্ঞানের বিপ্লবে ডারুইন, হুকার, ওয়ালেস, হাক্সলি প্রমুখের কাজের পূর্বে যে বিজ্ঞানীর কাজের নাম আসে তিনি হুমবোল্ট। ভূবিদ্যায় হুমবোল্ট-এর কাজ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন ডারুইন এবং অন্য বিজ্ঞানীরা।

হুমবোল্টে-এর জন্ম ১৭৬৯ সালে। তাঁর পিতা মেজর ফন হুমবোল্ট ছিলেন ফ্রেডারিক দি গ্রেট-এর চেম্বারলেন। আলেকজাণ্ডার ফন হুমবোল্ট-এর মধ্যে ছোটবেলা থেকেই দেখা গিয়েছিলো অনুসন্ধিৎসা আর কৌতূহল। পিতার লাইব্রেরীর বইগুলো শেষ করতে আলেকজাণ্ডার-এর তাই তেমন বেশি দিন লাগেনি। এরপর আলেকজাণ্ডার বেরিয়ে পড়লেন বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে পাঠ নিতে। তাঁর প্রথম বিদেশযাত্রা 'পিজারো' জাহাজে চড়ে। স্পেনের এই জাহাজটি যাচ্ছিলো মেক্সিকো আর কিউবার উদ্দেশ্যে। স্পেনের রাজার বিশেষ অনুগ্রহে আলেকজাণ্ডার এই সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এমেবঁপ্লান্দ নামে আরেকজন বিজ্ঞানী। তাঁরা দু'জনে দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ ভূভাগে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মেক্সিকো ও কিউবা হয়ে হুমবোল্ট গেলেন উত্তর আমেরিকায়। এখানে ফিলাডেলফিয়া এবং ওয়াশিংটনে কিছুদিন কাটিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন।

তারপর তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কসমস'। ছ'টি খণ্ডে বিভক্ত এই বইতে তিনি প্রথম অংশে তাঁর ভ্রমণের বর্ণনা দেন। অন্য অংশগুলোয় তিনি আলোচনা করেন জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে। 'কসমস'-এর শেষ খণ্ড প্রকাশিত হবার পর বার্লিন-এর মার্কিন দূতাবাস তাঁকে জর্জ ওয়াশিংটনের জন্মদিনের উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। এখানে তাঁকে বিজ্ঞানের রাজা বলে সম্বর্ধনা জানানো হয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে আলেকজাণ্ডার ফন হুমবোল্টকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের জনক নামে অভিহিত করা হয়। বস্তুত হুমবোল্টই প্রথম প্রকৃতিবিজ্ঞানকে সুচারুরূপে বৈজ্ঞানিক ধারায় বিশ্লেষণ করেন।

'কসমস' ব্যতীত তাঁর অন্যান্য বই হচ্ছে: আসপেক্টস অব নেচার, ভয়েজ টু দি ইকুয়িনকসিয়াল রিজিয়নস অব দি নিউ কন্টিনেণ্ট, দি মাউন্টেইনস অ্যাণ্ড দি ক্লাইমেট অব সেন্ট্রাল এশিয়া, দি জিওগ্রাফি অব দি নিউ কন্টিনেণ্ট, দি নিউ স্পিসিজ অব প্ল্যাণ্টস এবং দি কিংডম অব নিউ স্পেন।

প্রায় ৯০ বছর বয়সে তাঁর প্রিয় বসন্তে আলেকজাণ্ডার ফন হুমবোল্ট এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে নতুন অজানা এক পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

ডারুইন এবং অন্য বিজ্ঞানীরা হুমবোল্ট-এর রচনাসমূহ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হন। তাঁরা কৃতজ্ঞতার সাথে হুমবোল্ট-এর এই অবদানের কথা স্বীকার করেছেন তাঁদের বিভিন্ন রচনায়।

বংশগতিবিদ্যা ও মেণ্ডেল

ডারুইন লক্ষ্য করেছিলেন, প্রত্যেকটি জীবেরই নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে আর এসব বৈশিষ্ট্য জীবটির সন্তানের মধ্যেও প্রকাশ পায়। এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ডারুইন তৎকালীন প্রচলিত মতকেই মেনে নিয়েছিলেন। সে সময়ে ধারণা ছিল, সন্তানের মধ্যে বাপ ও মায়ের মিলিত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। কিন্তু এই মতবাদ কতকগুলি বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। যেমন, একই মায়ের পেটের ভাইদের মধ্যে কেন তাহলে পার্থক্য দেখা যায়? আবার সন্তানের মধ্যে বাপ ও মায়ের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ই যদি শুধু ঘটতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হবে যখন আর কোনো নতুন বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনা থাকবে না। অর্থাৎ বংশগতিতে বিবিধায়ন লোপ পাবে। আর বিবিধায়ন যদি না থাকে তাহলে ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বটিই অচল হয়ে পড়ে। ফরাসী বিজ্ঞানী লেমার্ক-এর ধারণা ছিল ইচ্ছা, অভ্যাস, ব্যবহার বা অপব্যবহারের ফলে জীবদেহ বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং পরে এই অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁর এই ধারণার সাথে বাস্তব নিদর্শনের তেমন মিল ছিল না।



অতএব দেখা যাচ্ছে, জীবের বিবিধায়নের ব্যাপারটি ডারুইন ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। এই ব্যাখ্যা যাঁর গবেষণা থেকে প্রথম পাওয়া গিয়েছিল তিনি হচ্ছেন মেণ্ডেল। মেণ্ডেলের গবেষণার ফলাফল ১৮৬৫ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু ১৯০০ সালের আগে

পর্যন্ত তিনি প্রায় অনাবিষ্কৃতই ছিলেন। ডারুইন নিজেও এ খবর রাখতেন বলে মনে হয় না।

১৮২২ সালের জুলাই মাসে একটি কৃষক পরিবারে জোহান মেণ্ডেলের জন্ম। জন্মস্থান মোরাভিয়া, সে-সময়ে অস্ট্রিয়ার অংশ, এখন চেকো-শ্লোভাকিয়ার। ছেলেবেলা থেকেই বাবাকে কৃষি ও বাগানের কাজে সাহায্য করতেন। এ থেকেই তিনি প্রকৃতি-প্রেমিক হয়ে উঠেছিলেন। লেখাপড়া প্রথমে গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে, তারপরে শহরের মাধ্যমিক স্কুলে। সতেরো বছর বয়সে স্কুলের পড়া শেষ করে চার বছর পড়েন একটি ইনস্টিটিউটে। মেণ্ডেল পরিবারের আর্থিক অবস্থা কখনো তেমন সচ্ছল ছিল না। এ সময় তা আরো খারাপ হয়ে পড়ে। একুশ বছর বয়সে জোহান তাঁর এক শিক্ষকের পরামর্শে শিক্ষানবিস হিসেবে পাদ্রী-সম্প্রদায়ে যোগ দেন ১৮৪৩ সালের শরতে। নতুন নাম হল গ্রেগরিয়াস বা গ্রেগর। ব্রাদার গ্রেগরিয়াস মঠস্কুলে ধর্মতত্ত্ব ও প্রাচীন প্রাচ্যভাষা শিক্ষা করতেন। তাছাড়াও তিনি ব্রিউনের দর্শন ইনস্টিটিউটে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বক্তৃতা শুনতে যেতেন। মঠের খনিজ ও উদ্ভিদের সংগ্রহ তদারকির সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তাঁর উপর এবং তা নিয়েই তিনি সময় কাটাতেন। ১৮৪৭ সালে গ্রেগর যাজক পদে উন্নীত হন। তারপর তাঁর জীবন কেটেছিল স্থানীয় মাধ্যমিক স্কুলে বদলি শিক্ষক হিসেবে পড়িয়ে আর মঠের বাগানে নিজস্ব ধরনের গবেষণা করে। প্রথমে তিনি পড়াতেন অঙ্ক ও ভাষা। এর মাঝে ১৮৫১ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চার সেমিস্টার পড়াশুনাও করেন।

ভিয়েনা থেকে ফেরার পরই মেণ্ডেল পরিকল্পিত উপায়ে তাঁর গবেষণার কাজ শুরু করেন। সঙ্করণ বিষয়ে তাঁর কৌতূহল ছিল আগে থেকেই। গবেষণার জন্য তিনি মটর চারা বেছে নিলেন। পরীক্ষার উপকরণ নির্বাচনেও মেণ্ডেলের অনেক সময় লেগেছিল। পরীক্ষাধীন উপকরণের কোন্ কোন্ গুণ থাকা প্রয়োজন তাঁর নিবন্ধে তিনি তাও লিখেছিলেন। এরপর ছিল ক্রমাগত দশ বছর ধরে মটরশুঁটি নিয়ে তাঁর পরিকল্পিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অতঃপর ১৮৬৪ সালে গবেষণার কাজ শেষ করে তিনি তাঁর প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে 'উদ্ভিদ সঙ্করণ পরীক্ষা' নামে পরিচিত তাঁর বিখ্যাত রচনাটি লিখলেন। ১৮৬৫ সালে একটি পত্রিকায় তাঁর এই দীর্ঘ গবেষণা প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু মেণ্ডেলের গবেষণার গুরুত্ব তখনো কেউ অনুধাবন করতে পারেনি। ১৮৮৪ সালে মেণ্ডেল মৃত্যুবরণ করেন। ১৯০০ সালে তিনজন ইউরোপীয় বিজ্ঞানী—ডাচ উদ্ভিদবিজ্ঞানী হুগো ডেভ্রিস, জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী কার্ল লরেন্স এবং অস্ট্রিয় বিজ্ঞানী এরিখ

চেরমাক দীর্ঘকাল-বিস্মৃত সেই প্রবন্ধটি পুনরাবিষ্কার করেন। পৃথক পৃথক-ভাবে এই তিন বিজ্ঞানীই মেণ্ডেলের বংশগতির নিয়মাবলীর কথা উল্লেখ করেছিলেন তাঁদের তিনটি ভিন্ন প্রবন্ধে। এর পরই মেণ্ডেলের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সত্যতা অনুসন্ধান শুরু করেন বহু বিজ্ঞানী এবং সকলেই তা সমস্বরে সমর্থন করলেন।

মেণ্ডেল আবিষ্কার করেছিলেন বংশগতির সূত্র—পারিবারিক বৈশিষ্ট্য কি-ভাবে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়ে থাকে, তার নিয়ম। এজন্য তাঁকে প্রায় দশ বছর ধরে নিখুঁত একটি পরিকল্পনা নিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর আগে আর কোনো পরীক্ষাই এত নিখুঁতভাবে ও শুদ্ধতার সঙ্গে পরিচালিত হয়নি।

মেণ্ডেলবাদ আধুনিক বংশগতিবিদ্যার ভিত্তিস্বরূপ। বংশগতিবিদ্যার অন্যতম প্রধান ও প্রথম স্থপতি টি. এইচ. মর্গান লিখেছিলেন: 'মেণ্ডেল মঠোদ্যানে দশ বছর উদ্ভিদ নিয়ে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন জীববিজ্ঞানের বিগত ৫০০ বছরের ইতিহাসে তা শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার।'

মেণ্ডেলবাদের মূল কথা হ'ল—জৈব-ব্যক্তিত্ব কতকগুলি গুণের সমবায়। কিন্তু গুণগুলি তার স্বোপার্জিত সম্পত্তি নয়, এগুলি তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া। গুণের আধার ক্রোমোসোম। ক্রোমোসোমেরও ভাগ আছে, বহু পারমাণবিক বিন্দু সমাবেশে সেগুলি গঠিত। বংশানু-ক্রমেয় আদিম আধার ক্রোমোসোমের এই ক্ষুদ্রাংশগুলিকে 'জীন' বলে। প্রত্যেক জীন এক একটি 'মেণ্ডেলিয়ান' গুণ প্রকাশের জন্য দায়ী।

নবম পরিচ্ছেদ

বিদ্যুতের আরো কথা

বিজ্ঞানের ইতিহাসে গ্যালিলিও, নিউটন, লাভোয়াসিয়ে এবং ডারুইনের সাথে আরেকজন বিজ্ঞানীর নাম সমভাবে উল্লেখ্য। তিনি মাইকেল ফ্যারাডে। বিদ্যুৎ এবং চুম্বক নিয়ে তিনি যে গবেষণা করেন আজকের দিনে তার প্রয়োগ সবচাইতে বেশি। হ্যাঁ, আমি বিদ্যুতের কথাই বলতে চাইছি। আমাদের জীবনে আজ বিদ্যুতের ব্যবহার যে কত ব্যাপক একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই আমরা তা বুঝতে পারি। যেমন, আমাদের ঘরে জ্বলছে বিদ্যুতের বাতি, মাথার ওপরে বৈদ্যুতিক পাখা, চারতলা পাঁচতলা বাড়ির ছাদে পানির ট্যাংকে পানি তোলার জন্যে চালানো হচ্ছে বৈদ্যুতিক পাম্প এবং এমনি আরো হাজার রকম কাজ। তাছাড়া আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য সবকিছুতেই আমরা বিদ্যুতের অভ্রান্ত অবদান লক্ষ্য না করে পারি না। মোট কথা আধুনিক সভ্যতার জিয়নকাঠি এই বিদ্যুৎ। মানুষের অগ্রযাত্রার একমাত্র অভ্রান্ত হাতিয়ারও আজ এই বিদ্যুৎ। সেজন্যই আজকাল কোনো দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও সম্পদে কতখানি সমৃদ্ধ তার মাপকাঠি হচ্ছে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ। তাই বিদ্যুৎকে আমরা আর খাটো করে দেখতে পারিনা। আর বিদ্যুৎকে আমাদের জীবনে যাঁরা এনে দিয়েছেন সে সব বিজ্ঞানীদের তো নয়ই। এ বইয়ে কিছু আগে আমরা দু'জন বিজ্ঞানীর কথা বলেছি। সে দু'জন হচ্ছেন গ্যালভানি এবং বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন। গ্যালভানি তাঁর মৃত ব্যাঙের পরীক্ষায় আর ফ্রাংকলিন বজ্রঝড়ের সময় ঘুড়ি উড়িয়ে এই বিদ্যুতের কিছুটা হদিশ করতে পেরেছিলেন। সে ছিল স্থিরবিদ্যুৎ। এবারে বিজ্ঞানীদের মনে এলো বিদ্যুৎ প্রয়োগ করার চিন্তা। শুরু হলো চলবিদ্যুৎ আবিষ্কারের চেষ্টা। আর আশ্চর্য, এই বিদ্যুৎ নিয়ে পরীক্ষার সময়ই দেখা গেল চুম্বকের সাথে বিদ্যুতের একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

গ্রীক-বিজ্ঞানী সেলেজ

কিন্তু সে কথা থাক। তার আগে যাওয়া যাক বিদ্যুতের আসল কাহিনীর দিকে। সে কাহিনী অনেক পুরনো। ইংরেজীতে বিদ্যুৎকে বলা হয় ইলেকট্রিসিটি। এ শব্দটা এসেছে ইলেকট্রন থেকে। এই ইলেকট্রন শব্দটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীস দেশের জ্ঞানীপুরুষ সেলেজ একদিন আবিষ্কার করেন যে, পাইন গাছের রস জমে হাজার হাজার বছর মাটির নীচে থেকে জমাট বেঁধে পাথরের টুকরোর মতো হয়ে যায়। তখন বহুমূল্য ধাতু হিসেবে এগুলো অলংকারে ব্যবহার করা হতো। সেলেজ একদিন এরকম একটুকরো জমাট পাথর নিয়ে তাঁর জামার হাতার সঙ্গে ঘষছিলেন। তখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ঘষবার সময় সেই ছোট টুকরোটি কাপড় এবং শুকনো পাতা আকর্ষণ করছে। তারপর আরো কিছুটা গবেষণা করে তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই জমাট টুকরোটির একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। তিনি এই আকর্ষণী শক্তির নাম দিলেন ইলেকট্রিসিটি, কারণ অই জমাট টুকরোটির নাম ছিল তখন ইলেকট্রন। কিন্তু সেলেজের এই আবিষ্কার স্তব্ধ হয়ে রইলো প্রায় দু'হাজার বছর ধরে। ব্যাপারটা শুধুমাত্র বিস্ময় আর কৌতুকের বিষয় হয়েই রইল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে রানী এলিজাবেথের রাজত্বের সময় স্যার উইলিয়াম গিলবার্ট নামে একজন ইংরেজ ঘোষণা করেন যে, সেলেজের সেই জমাট পাইন রসের টুকরোটি ছাড়াও গ্লাস, সালফার, মাইকা, হীরক প্রভৃতিতে এ ধরনের ইলেকট্রিসিটি রয়েছে। তারপর অবশ্য আবার ব্যাপারটা যথারীতি চাপা পড়ে যায়। এরপর ১৭৯১ সালে আবার এই ইলেকট্রিসিটি এগিয়ে আসে সামনে। ব্যাঙের বিচ্ছিন্ন পা নিয়ে গবেগণা করতে গিয়ে গ্যালভানি দেখেন যে, দু'টি ভিন্ন ধাতু তামা ও লোহাকে সংযুক্ত করে ব্যাঙের পায়ে লাগলে মরা পা নড়ে ওঠে। গ্যালভানির মতে মাংসপেশী সংকুচিত হওয়ার ফলেই এটা ঘটে।

এর কয়েক বছর পর আলেসেন্দ্রো ভোল্টা নামে আরেকজন ইতালীয় বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন যে, দু'টি ভিন্ন ধাতুর একত্রে সংযোগের ফলে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি হয় তা থেকেই মাংসপেশীর সংকোচন ঘটে। এটা তিনি প্রমাণ করলেন কতকগুলো দস্তা ও তামার থালার মধ্যে এসিড মিশ্রিত চামড়া বা কাপড়ের টুকরো লাগিয়ে ভোল্টাইক পাইল বা ব্যাটারী তৈরি করে। বলা যেতে পারে, বিদ্যুৎ-কোষ বা ব্যাটারী প্রথম ভোল্টাই তৈরি করেন। ভোল্টার এই আবিষ্কারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে বৈদ্যুতিক চাপের এককে ভোল্ট বলা হয়।

আঁদ্রে এমপিয়ার

এরপর ১৮১০ সালে আঁদ্রে এমপিয়ার নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী ভোল্টাইক ব্যাটারীর সহায়তায় চুম্বক ও বিদ্যুৎ-প্রবাহের মধ্যে একটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। অবশ্য এর কয়েকমাস আগে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী ওরেস্টেড ঘোষণা করেন যে, বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলাচলকারী একটি তারের কাছে কম্পাস যন্ত্র নিয়ে এলে এটি অদ্ভুত-



ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এমপিয়ার আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে হাতেকলমে দেখলেন যে, বিদ্যুৎ-শক্তি আসলে চুম্বকত্ব সৃষ্টি করে। এটি প্রমাণ করার জন্য তিনি একটি তারের বাণ্ডিলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালিত করে দেখালেন যে, তারের বাণ্ডিল অবিকল চুম্বকের মতো ব্যবহার করছে। এমপিয়ারের আবিষ্কারের জন্য তাঁর নামানুসারে বিদ্যুৎ-প্রবাহের এককে এমপিয়ার বলা হয়ে থাকে।

ওহম্ ও ফ্রাংকলিন

এর কয়েক বছর পরে জার্মান বিজ্ঞানী জর্জ সাইমন ওহম দেখান যে, তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় তারের দ্বারা বিদ্যুৎ কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তারের দৈর্ঘ্য, পরিমাণ ও তারের ধাতুর বিভিন্নতা অনুসারে এই বাধার তারতম্য ঘটে। এই মহৎ উদ্ভাবনার জন্য বিদ্যুৎ-প্রবাহের বাধা-দানের একক সংখ্যাকে বলা হয় ওহম।

এদিকে ১৭৫২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ঝড়ের সময় ঘুড়ি ওড়ানোর মারাত্মক পরীক্ষার মাধ্যমে বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন প্রমাণ করেছিলেন, আকাশের

বিদ্যুৎ হচ্ছে তড়িৎ-শক্তি। ফ্রাংকলিন এই মত প্রচার করেন যে, বিদ্যুৎ-শক্তি দু'ধরনের—ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। পানি যেমন নলের ভেতর দিয়ে চলাচল করে তেমনি বিদ্যুৎও বিদ্যুৎবাহী ধাতুর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। এই ধাতুকে বলা হয় কণ্ডাকটর বা পরিবাহী।

মাইকেল ফ্যারাডে ও হামফ্রে ডেভী

১৮৩০ সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে এই প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেন যে, তড়িৎ যদি ওরেস্টেড ও এম্পিয়ার-এর প্রদর্শিত উপায়ে চুম্বকত্ব সৃষ্টি করে তাহলে বিপরীতভাবে চুম্বকও তড়িৎ সৃষ্টি করতে পারবেনা কেন? বস্তুত ফ্যারাডের ধারণাই অবশেষে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের মাঝে রয়েছে পারস্পরিক এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আর আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানে চুম্বক ও তড়িৎ-এর এই সম্পর্ককে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আমাদের সব কাজে বিদুৎ-এর ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে এরই বদৌলতে।

মাইকেল ফ্যারাডের জন্ম ১৭৯১ সালে। তাঁর পিতা ছিলেন লণ্ডনের একজন কামার। ফ্যারাডে ছিলেন পিতামাতার তৃতীয় পুত্র-সন্তান। ফ্যারাডের পিতার আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না, তাই মাত্র তেরো বছর বয়সেই শিক্ষানবীশ হিসেবে তাঁকে কাজ শুরু করতে হয় এক বই-বাঁধাই-এর কারখানায়। কারখানার মালিক ভদ্রলোকটি বেশ ভালো লোক ছিলেন। তিনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে ফ্যারাডেকে বই পড়ার অনুমতি দেন। এই সময় ফ্যারাডে 'রসায়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষা' নামে একটি বই এবং বিশ্বকোষে বিদ্যুৎ সম্পর্কে একটি লেখা পড়ে শেষ করেন। এর সাথে সাথে তিনি বিজ্ঞান-বিষয়ক আরো বই পাঠ করেন। এতে বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ বেশ বেড়ে যায়। তখন তিনি প্রতি সন্ধ্যায় রয়েল ইনস্টিটিউশনে স্যার হামফ্রে ডেভীর বক্তৃতা শুনতে যেতেন। তিনি বসে বসে স্যার ডেভীর বক্তৃতার নোট নিতেন আর বাড়ি ফিরে তা কপি করে ফেলতেন। বই-বাঁধাই-এর কারখানায় সাত বছর কাজ করার পর ফ্যারাডে ঠিক করলেন এ-কাজ তিনি ছেড়ে দেবেন। এবার তিনি রয়েল ইনস্টিটিউশনে একটি চাকরি চেয়ে স্যার হামফ্রে ডেভীর কাছে একটি চিঠি লিখলেন, সাথে পাঠালেন ডেভীর সেই বক্তৃতার নোটের কপিসমূহ। অবশেষে চাকরি হলো ফ্যারাডের। বাইশ বছর বয়সে চাকরি পেলেন তিনি, ল্যাবরেটরীর সহকারীর চাকরি, বেতন সপ্তাহে পঁচিশ শিলিং।

স্যার হামফ্রে ডেভী এ সময় তাঁর সেফটি-ল্যামন নিয়ে কাজ করছিলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্যার হামফ্রে ডেভী বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর এই বিখ্যাত 'সেফটি ল্যাম্প' আবিষ্কারের জন্যে। হামফ্রে ডেভী অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথমদিককার অগ্রগণ্য বিজ্ঞানীদের অন্যতম। তিনি প্রধানত কাজ করেছিলেন বিদ্যুৎ এবং রসায়ন নিয়ে। কিন্তু খনিতে ব্যবহারযোগ্য 'নিরাপদ বাতি'র জন্যই তিনি অধিকতর খ্যাত। তাঁর এই আবিষ্কারের পূর্বে কয়লা খনিতে প্রায়ই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতো। খনিতে শ্রমিকরা যে বাতি নিয়ে যেতো সে বাতি থেকে খনি-গহ্বরে আগুন ছড়িয়ে পড়তো সেখানে জমে-থাকা গ্যাসের কারণে। এর ফলে ঘটতো মারাত্মক বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণের ফলে খনির অভ্যন্তরে প্রায়ই যে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতো তাতে বহু খনি-শ্রমিক প্রাণ হারাতো।



ডেভী গ্যাসে আগুন ছড়িয়ে পড়ার কারণটা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা চালালেন। খনি গহ্বরে নেমে সরেজমিনে সবকিছু দেখেও এলেন। তারপর তিনি তৈরি করলেন 'সেফটি-ল্যাম্প'। সেফটি-ল্যাম্প আর কিছুই নয়, দু'প্রস্থ তামার তারের জালের ভেতরে রাখা সাধারণ বাতিই। ডেভী দেখলেন যে, এরকম তারে ছাঁকনীর বাইরে বাতির শিখা আসতে পারেনা, ফলে গ্যাসে আগুন ধরার সম্ভাবনা থাকেনা। ডেভীর এই আবিষ্কারের ফলে খনি-শ্রমিকদের জীবনে নিরাপত্তা ফিরে আসে। স্যার হামফ্রে ডেভীর জন্ম ১৭৭৮ সালে, ইংল্যাণ্ডে। ডেভীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হচ্ছে 'ইলেকট্রিক আর্ক'। তিনি নিজে একটি

বিরাট ব্যাটারী নির্মাণ করেন। এটায় ৩০,০০০ ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যেতো। ১৮০১ সালে ডেভী 'কারেন্ট'-এর সাহায্যে তরল পদার্থ ভাঙার চেষ্টা করেন। তরল 'কস্টিকসোডা'র মধ্যে 'কারেন্ট' চালিয়ে তিনিই প্রথম ১৮০৭ সালে 'সোডিয়াম' ধাতু আলাদা করতে সমর্থ হন। ১৮০৮ সালে একই উপায়ে তিনি 'পটাসিয়াম ধাতু' আলাদা করেন।

রয়েল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতা দিয়ে ডেভী খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা তখন খুব বেড়ে গিয়েছিলো। আর শেষে স্যার হামফ্রে ডেভী রয়েল ইনস্টিটিউশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮২৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

রয়েল ইনস্টিটিউশনের ল্যাবরেটরী-সহকারী হিসেবে যোগদানের পর ফ্যারাডে স্যার ডেভীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। এ সময় ছ'জন বিজ্ঞানীর কাজের জন্য ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক করে তারপর ফ্যারাডে নিজের গবেষণার কাজ করতেন। এভাবে অসম্ভব পরিশ্রম করে ফ্যারাডে তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতেন। ফ্যারাডে তখন চুম্বক ও বিদ্যুতের সম্পর্ক নিয়ে কাজ করছিলেন। তিনি দেখেন যে, চুম্বকও বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। এর আগে ১৮২০ সালে কোপেনহাগেনে ওরেস্টেড দেখিয়েছিলেন যে, বিদ্যুৎ চুম্বকত্ব সৃষ্টি করে। ১৮২১ সালে ফ্যারাডে 'হিস্টরিক্যাল স্কেচেস অব ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর ফ্যারাডের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৮২৩ সালে ফ্যারাডে রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। আর এর দু'বছর পর তিনি রয়েল ইনস্টিটিউশনের পরিচালক পদে নির্বাচিত হন।

আমরা আজকাল বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে যে 'ডাইনামো' ব্যবহার করি তা ফ্যারাডের আবিষ্কারেরই ফসল। ফ্যারাডে তাঁর 'ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইনডাকশন'-এর জন্যে যে যন্ত্রটি ব্যবহার করেছিলেন আধুনিক ডাইনামো তারই পরিবর্ধিত রূপ মাত্র।

ফ্যারাডেই প্রথম বিদ্যুৎ ও চুম্বক-শক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন এবং এই শক্তি বোঝানোর জন্যে 'ফিল্ড' বা ক্ষেত্র কথাটি ব্যবহার করেন। ফ্যারাডের আবিষ্কারের প্রয়োগ আজ অত্যন্ত বেশি এবং তাঁর এই কাজ ছিল সুদূরপ্রসারী। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান মূলত অনেকাংশে এই 'ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইনডাকশন' বা 'বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় আবেশ'-এর উপর নির্ভরশীল। আমরা তাই ফ্যারাডেকে 'ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম'-এর জনক বলে অভিহিত করতে পারি।

১৮৫৭ সালে প্রফেসর টিণ্ড্যাল ফ্যারাডেকে রয়েল সোসাইটির সভাপতির পদ গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। কিন্তু ফ্যারাডে বলেন তিনি শুধু মাইকেল ফ্যারাডে হয়েই বেঁচে থাকতে চান। সরল অনাড়ম্বর অধ্যবসায়ী এই বিজ্ঞানী ১৮৬৭ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

বিদ্যুতের গবেষণায় মাইকেল ফ্যারাডের সাথে অন্য যে বিজ্ঞানীর নাম একই সাথে উচ্চারিত হওয়া উচিত তিনি জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। নিউটন যেমন তাঁর পুরোধা বিজ্ঞানী গ্যালিও-র ধারণাসমূহের সঠিক ও নির্ভুল গাণিতিক রূপ প্রদান করেন, তেমনই ম্যাক্সওয়েলও ফ্যারাডের আবিষ্কারের গাণিতিক রূপ প্রদান করেন। ম্যাক্সওয়েল-এর এই আবিষ্কার 'ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ' নামে বিখ্যাত। এ সমীকরণগুলো চুম্বক ক্ষেত্রে, তড়িৎ-ক্ষেত্রে এবং তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে আকর্ষণকারী অথবা চাপপ্রয়োগকারী শক্তির পরিমাণ নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।



ফ্যারাডে যে বছর তড়িৎ-চৌম্বক আবেশ আবিষ্কার করেন সে বছর অর্থাৎ ১৮৩১ সালে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল-এর জন্ম। গ্রামেই ম্যাক্সওয়েল-এর শৈশব অতিবাহিত হয়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ভীষণ কৌতূহলী এবং অনুসন্ধিৎসু। যে কোনো যন্ত্র দেখলেই তিনি তা নেড়েচেড়ে দেখার লোভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারতেন না, আর শেষ পর্যন্ত তাঁকে জানতেই হতো যন্ত্রটি কিভাবে তৈরি হয়েছে।

স্কুলের পড়া শেষ করে ম্যাক্সওয়েল ষোলো বছর বয়সেই এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন! সেখানে তিন বছর লেখাপড়া করার পর তিনি ১৮৫০ সালে কেমব্রিজের পিটারহাউস-এ ভর্তি হন। তারপর সেখান থেকে যান ট্রিনিটি কলেজে। এখান থেকে তিনি ডিগ্রি লাভ করেন দ্বিতীয় র‍্যাংলার হিসেবে। তারপর ১৮৫৫ সালে ম্যাক্সওয়েল ট্রিনিটি কলেজের ফেলোশিপ লাভ করেন এবং ১৮৫৬ সালে এবারডিন-এ 'ন্যাচারাল ফিলসফি'র অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এরপর ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত ম্যাক্সওয়েল লণ্ডনের কিংস কলেজে অধ্যাপনা করেন। কিংস কলেজের এই পাঁচ বছর ছিল ম্যাক্সওয়েলের জীবনের সবচেয়ে ফলপ্রসূ সময়।

আমরা ফ্যারাডের আবিষ্কার সম্পর্কে তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের কথা বলেছি। এই ক্ষেত্র আসলে কি? যেমন এক খণ্ড চুম্বকের কাছে যদি এক টুকরো লোহা রাখা হয় তাহলে অই চুম্বক লোহাটিকে আকর্ষণ করবে। এই আকর্ষণ অবশ্য চুম্বক এবং লৌহখণ্ডটির পরস্পরের দূরত্বের উপর নির্ভর করবে। লোহাটি যদি খুব দূরে থাকে তাহলে এই আকর্ষণক্ষমতা অতদূর পৌঁছাবেনা। যে এলাকায় চৌম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা কাজ করবে সে এলাকাটিকে সাধারণত চৌম্বক ক্ষেত্র বলা হয়। অনুরূপভাবে যেখানে তড়িৎ-চৌম্বক আকর্ষণ কাজ করবে সে এলাকাকে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র বলা যায়।

এ সময় ডব্লিউ ওয়েবার এবং তাঁর সঙ্গী কোহলরাশ একটি পরীক্ষা করে দেখান যে, তড়িৎ-চৌম্বক শক্তির একক স্থিরবিদ্যুৎ-শক্তি এককের চেয়ে ৩০০০,০০০ গুণ বড়। আশ্চর্য এই, এক সেকেণ্ডে আলোর গতিও হচ্ছে অনুরূপ অর্থাৎ ৩০০০,০০০ মিটার। এখান থেকে ম্যাক্সওয়েল সিদ্ধান্তে আসেন যে, আলোও আসলে তড়িৎ-চৌম্বকীয় আলোড়ন এবং তা তড়িৎ-চৌম্বক নিয়মাবলী মেনে চলে। ১৮৬৪ সালে ম্যাক্সওয়েল যে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের ভবিষ্যদ্বাণী করেন, পরে বেতার-তরঙ্গের আবিষ্কারের পর তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। অবশ্য ফ্যারাডেও ১৮৩২ সালে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু তা প্রকাশ করার পরিবর্তে তিনি সীলকরা খামে এই সিদ্ধান্তের কথা লিখে রয়েল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেন এবং অনুরোধ জানান যেন তাঁর মৃত্যুর পর খামটি খোলা হয়। এই খামটি খোলা হয় ১৯৬৮ সালে। এবং তখনই জানা যায় যে ফ্যারাডেই প্রথম এই তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের কথা চিন্তা করেছিলেন। অবশ্য ম্যাক্সওয়েল যেভাবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করেছিলেন, ফ্যারাডে তা করেন নি। ফ্যারাডের ধারণা ছিল

তত্ত্বীয় ধারণা মাত্র। ম্যাক্সওয়েল এই তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের গাণিতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আর এই ব্যাখ্যার জন্য তিনি নতুন ধরনের গাণিতিক প্রক্রিয়া 'ভেক্টর অ্যানালিসিস' উদ্ভাবন করেন। এই 'ভেক্টর অ্যানালিসিস'-এর মাধ্যমে ম্যাক্সওয়েল যে সমীকরণসমূহ আবিষ্কার করেন তা আজ 'ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ' নামে পরিচিত আর তড়িৎ-চৌম্বকের এই তত্ত্বকে বলা হয় 'ফ্যারাডে-ম্যাক্সওয়েল তত্ত্ব'। ১৮৭১ সালে ম্যাক্সওয়েল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এ-সময় তাঁরই তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয় বিখ্যাত 'ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরী'। ১৮৭৯ সালে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রথম দিকে ম্যাক্সওয়েল-এর এই তত্ত্ব অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। বিজ্ঞানীরা অনেকেই বলেন যে, ম্যাক্সওয়েল গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে যে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের কথা বলেছেন বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। ম্যাক্সওয়েল নিজেও কখনো গবেষণাগারে কোনো পরীক্ষার মাধ্যমে এই তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন নি। তবে ম্যাক্সওয়েল-এর মৃত্যুর মাত্র ৯ বছর পর বিজ্ঞানী হাইনরিখ্ হার্ৎস ল্যাবরেটরীতে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তৈরি করতে সক্ষম হন।

হাইনরিখ্ হার্ৎস্

হাইনরিখ্ হার্ৎস ছিলেন প্রথম ইউরোপীয় বিজ্ঞানী যিনি ম্যাক্সওয়েল-এর তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গতত্ত্ব অনুমোদন করেন। তিনি বলেন, ম্যাক্সওয়েল-এর সমীকরণই তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রকে সঠিকভাবে বুঝাতে পারে। আর ১৮৮৮ সালে হার্ৎস তাঁর গবেষণাগারে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ তৈরি করতে সক্ষম হন। হার্ৎস-এর আবিষ্কারের ফলে ম্যাক্সওয়েল-এর তত্ত্ব সম্পর্কে সব সন্দেহ দূর হলো। বিজ্ঞানীদের সামনে খুলে গেলো সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। এই তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ব্যবহার করেই পরে উদ্ভাবিত হয় বেতার যন্ত্র। আজকের দিনে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের ব্যবহার অকল্পনীয়।

জার্মান বিজ্ঞানী হার্ৎস-এর জন্ম ১৮৫৭ সালে। বার্লিন ইনস্টিটিউট-এ বিজ্ঞানী হেলমহোয-এর সহকারী হিসেবেই হার্ৎস প্রথম তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এখানে থাকতেই তিনি গ্যাসে বৈদ্যুতিক ক্ষরণ বা ইলেকট্রিক ডিসচার্জ আবিষ্কার করেন। ১৮৮৫ সালে হার্ৎস কার্লসরুহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানেই তিনি ম্যাক্সওয়েল-এর আলোক-তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ নিয়ে

গবেষণা শুরু করেন। ১৮৮৮ সালে হার্ৎস তাঁর গবেষণাগারে এই তরঙ্গ সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ আলোক-তরঙ্গেরই অনুরূপ এবং উভয়ের গতিবেগ সমান।

হার্ৎস এরপর বেতার-সংকেত নিয়ে কাজ করেন। তিনিই প্রথম মর্স বেতার সিগন্যাল প্রেরণে সক্ষম হন। এজন্য তাঁকে বেতার টেলিগ্রাফির জনক হিসেবে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

মাত্র ৩৭ বছর বয়সে এই প্রতিভাবান জার্মান বিজ্ঞানী পরলোক গমন করেন। এত অল্প বয়সে মৃত্যু না হলে হাইনরিখ হার্ৎস হয়তো বিজ্ঞানে আরো যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য আরো বেশি খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করতে পারতেন।

জোসেফ হেনরী

ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল এবং হার্ৎস-এর কথা আলোচনা করার সাথে সাথে বিদ্যুৎ-এর গবেষণা প্রসঙ্গে আরো একজন বিজ্ঞানীর কথা আমাদের স্মরণ করতে হয়। না, ইনি ইউরোপের কোনো বিজ্ঞানী ছিলেন না। ইনি আমেরিকান, নাম জোসেফ হেনরী। হ্যাঁ, সেই ১৭৫২ সালে, এই আমেরিকার মাটিতেই বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন একদিন ঝড়বৃষ্টির দিনে ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন, তারপর আর বিদ্যুৎ নিয়ে আমেরিকায় তেমন গবেষণা কিছু হয় নি।

এদিকে ইউরোপে চলছিলো নব আবিষ্কারের জয়যাত্রা। একের পর এক বিজ্ঞানীরা এগিয়ে চলছিলেন বিদ্যুতের বিচিত্র তথ্য আবিষ্কারের সড়ক ধরে। গ্যালভানি, এম্পিয়ার, ওরেস্টেড, ওহম, ডেভী আর ফ্যারাডে এগিয়ে নিয়ে গেলেন ইউরোপকে। আর আমেরিকা? না সেখানে তখনো বিজ্ঞানের এই বিরাট কর্মযজ্ঞের ছোঁয়া লাগেনি তেমন। কিন্তু আমেরিকায় তখন চলছে নতুন জাতি গড়ার নিরলস সাধনা। বিজ্ঞানীরা কতকাল আর পিছিয়ে থাকতে পারেন এ সাধনা থেকে। নিউইয়র্কের আলবানী শহরের জোসেফ হেনরীই খুলে দিলেন বিজ্ঞানের এই বদ্ধ দরজা।

হেনরীর জন্ম ১৭৯৭ সালে। তিনি ছিলেন পদার্থবিদ। চুম্বক আর বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করছিলেন হেনরী। ফ্যারাডে যে বছর তাঁর তড়িৎ-চৌম্বক আবেশ আবিষ্কার করলেন সেই একই বছর হেনরীও

তাঁর গবেষণায় গেলেন অনুরূপ ফল। তিনি তড়িৎ-চুম্বক নির্মাণ করলেন লোহায় তামার তার জড়িয়ে। কিন্তু অন্যদের চেয়ে আলাদাভাবে করলেন তিনি। খোলা তারের বদলে সিল্কের মোড়ক দিয়ে অতি সূক্ষ্ম তার ব্যবহার করলেন হেনরী। এর ফলে তারের পাক তিনি অধিক দিতে পারলেন। আর আশ্চর্য ফল হলো তাতে। তড়িৎ-চুম্বকের শক্তি বেড়ে গেল অনেক বেশি।

পরবর্তী দু'তিন বছর হেনরী কাজ করে চললেন এই তড়িৎ-চুম্বক নিয়ে। তড়িৎ-চুম্বকের সাহায্যে ভার উত্তোলন করার পরীক্ষা করতে করতে তিনি তাঁর নিজের একটি ওয়ার্কশপ গড়ে তুললেন। এটাই ছিল তাঁর ল্যাবরেটরী। ১৮৩১ সালে ইয়েল কলেজের জন্য একটি অতিকায় তড়িৎ-চুম্বক তৈরি করলেন হেনরী। তেইশশো পাউণ্ড ভার তুলতে সক্ষম হলো এটি। এর পরের বার যেটি নির্মাণ করলেন তিনি, সেটি পঁয়ত্রিশ হাজার পাউণ্ড ভার উত্তোলন করতে সক্ষম হলো।

জোসেফের সারা মন ভরে উঠলো আনন্দে। তড়িৎ-চুম্বক এবার অনেক কাজে আসবে মানুষের।

এবার হেনরী বসলেন চুম্বক থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের গবেষণায়। হেনরী ঘটির আকারে বাঁকানো তারের মুখে ব্যাটারী সংযোগ করলেন। সেই তারকে চুম্বক-ক্ষেত্রের বেষ্টনীর মধ্যে ঘোরালে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। ফ্যারাডের পরীক্ষার সঙ্গে হেনরীর পরীক্ষার কোনো মিল ছিলনা, কিন্তু তাঁরা দু'জনে একই ফল পেয়েছিলেন।

জোসেফ হেনরী আর মাইকেল ফ্যারাডে—এঁদের দু'জনের মধ্যে কে আগে এই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেছিলেন, এ নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসেনা। কারণ, এই কৃতিত্ব দু'জনেরই সমান প্রাপ্য। ফ্যারাডে ছিলেন ইংল্যাণ্ডের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী, তেমনি হেনরী ছিলেন আমেরিকার। দু'জনেই তাঁরা কাজ করেছেন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। একজনের খবর আর একজন জানতেন না। আর একই সময়ে দু'জনেই একই আবিষ্কার করেছেন। আর তাঁরা দু'জনেই নিজের নিজের দেশে সেদিন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। দু'জনের মধ্যে এতো মিল বলেই অনেকে হেনরীকে 'আমেরিকার ফ্যারাডে' বলে অভিহিত করেন।

সারা আমেরিকায় জোসেফ হেনরীর নাম ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের পরিচালক পদে নির্বাচিত হন। ১৮৪৬ সালে হেনরী এই পদটি গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী

বত্রিশ বছর তাঁর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি পরম যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর এই পদের দায়িত্ব পালন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, সেজন্য আমেরিকার অধিবাসীরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

তড়িৎ-বিজ্ঞানের বাইরেও হেনরীর অসামান্য অবদান রয়েছে। সমুদ্রের বাতিঘরগুলিতে তিমির চর্বি জ্বালানোর বদলে শূকরের চর্বি জ্বালানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনিই। সরকারের অনুরোধে তিনি এ নিয়ে গবেষণা করেন। হেনরীর এই পরামর্শের ফলে বছরে প্রায় এক লক্ষ ডলার খরচ বেঁচে যায়। বহুকাল পর্যন্ত আমেরিকায় এই ব্যবস্থাটিই বলবৎ ছিল।

১৮৭৮ সালে একাশি বছর বয়সে হেনরী পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর একদল তড়িৎ-বিজ্ঞানী জোসেফ হেনরীর আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভোল্টা, এমপিয়ার, ওহম ও ফ্যারাডের মতো তাঁর নামটিও চিরস্মরণীয় করে রাখার উদ্যোগ নেন। রেডিওতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ-উৎপাদনের একটি নয়া ইউনিটের নাম রাখা হয় তাঁর নাম অনুসারে। আজ রেডিও ও বৈদ্যুতিক কারিগরদের কাছে 'হেনরী' একটি অতি পরিচিত শব্দ।

আমেরিকার বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসেও হেনরীর নাম চিরস্মরণীয়। তিনি মার্কিন বিজ্ঞানচর্চার অগ্রপথিক। তাঁরই পথ ধরে আমেরিকা আজ বিশ্বের শীর্ষ বিজ্ঞানীদের দেশে পরিণত হয়েছে।

রূপকথার আশ্চর্য প্রদীপ

বিদ্যুৎ-শক্তির বিরাট সম্ভাবনার দ্বার যেদিন বিজ্ঞানীদের সামনে খুলে গেলো সেদিনটিতে হয়েছিলো মানব-সভ্যতার ইতিহাসে নতুন একটি যুগের শুরু। মানুষ যেন তার হাতে পেলো রূপকথার সেই আশ্চর্য প্রদীপ, যার আহ্বানে মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যায় সব কাজ, সব উপকরণ আসে নির্বিঘ্নে। কিন্তু বিদ্যুতের এই আশ্চর্য ক্ষমতা কাজে লাগানোর উপায় জানার জন্য মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ দিন, পরম ধৈর্যের সাথে করতে হয়েছে সাধনা। ব্যর্থতা এসে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে কখনো, নৈরাশ্যের আঁধার এসেছে নেমে, তবুও হাল ছেড়ে দেননি বিজ্ঞানীরা। আর শেষ পর্যন্ত এই সন্ধানী মানুষদের সাধনাই হয়েছে জয়ী। রনট্গেন, উইলিয়াম ক্রুকস, টমাস আলভা এডিসন—এঁরাই সেই সন্ধানী মানুষ।

ফ্যারাডের আবিষ্কারের ফলে উচ্চশক্তির বিদ্যুতের অসুবিধা আর তেমন ছিলোনা। বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণাগারে প্রয়োজনমতো উচ্চ ভোল্টেজ পেলেন তড়িৎ-চৌম্বক আবেশ ব্যবহার করে। এর ফলে পুরনো মেশিনগুলির ওপর নির্ভরতা অনেক কমে গেলো। ১৮৩৮ সালে আমেরিকার গ্রাফটন পেজ নামে এক ব্যক্তি ছোট একটি 'ট্রান্সফরমার' তৈরি করলেন। এর সাহায্যে ছোট একটি ব্যাটারী থেকেই অনেক বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হলো। ১৮৫১ সালে প্যারিসে হেনরিক রাহমকর্ফ তৈরি করলেন আরো শক্তিশালী ট্রান্সফর্মার, 'ইনডাকশন কয়েল'। এই কয়েল দীর্ঘ দিন ধরে 'রাহমকর্ফ কয়েল' নামে পরিচিত ছিলো। বিজ্ঞানীরা শূন্যে উচ্চচাপসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ডিসচার্জ নিয়ে গবেষণার কাজে এই কয়েল ব্যবহার করতে শুরু করলেন। ফ্যারাডে এবং উইলিয়াম ক্রুকস বায়ুশূন্য কাচের টিউবে উচ্চচাপসম্পন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিত করে দেখেন যে, বেশ কিছুটা ব্যবধান সত্ত্বেও এই টিউবে 'পজিটিভ' ও 'নেগেটিভ'-এর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে এবং এক ধরনের ম্লান আলো এতে সৃষ্টি হয়। টিউবের বাইরে এ ধরনের ব্যবধানে ও উচ্চচাপে সাধারণত বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় না। ফ্যারাডে টিউবের নেগেটিভ তারের নাম 'ক্যাথোড' এবং পজিটিভের নাম দেন 'অ্যানোড'। স্যার উইলিয়াম ক্রুকস দেখেন যে, সামান্য বায়ু অথবা অন্য কোনো গ্যাস থাকলে এই আলোর আভা টিউবটিতে সৃষ্টি হয়। আর যদি টিউবটিকে আরো বায়ুশূন্য করা হতে থাকে তাহলে ঠাণ্ডা সবুজ আলোয় টিউবটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এভাবে কয়েকটি পরীক্ষা চালিয়ে স্যার ক্রুকস দেখলেন, এই উজ্জ্বল আলো আসে 'ক্যাথোড' থেকে বিচ্ছুরিত অদৃশ্য রশ্মি থেকে। তিনি দেখলেন, এই রশ্মি সরল-রেখায় বিচ্ছুরিত হয়।

স্যার ক্রুকস-এর পর এ-ধরনের টিউব নিয়ে পরীক্ষা চালান জার্মানীর উইলহেম রন্টগেন। রন্টগেন-এর জন্ম ১৮৪৫ সালে। তিনি ১৮৯৫ সালে ক্রুকস-এর অনুরূপ টিউব নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখেন যে, টিউবটি একটি কালো কার্ডবোর্ড দিয়ে ঢেকে দিলেও এক ধরনের রহস্যজনক রশ্মি সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। রন্টগেন এই আলোর নাম দেন 'এক্স-রে'। এই 'এক্স-রে'কেই আমরা আজকাল রঞ্জনরশ্মি নামে অভিহিত করি তাঁর নামানুসারে।

রন্টগেন তাঁর পরীক্ষা অব্যাহত রাখলেন। তিনি দেখলেন, এই রশ্মি নির্গত হয় ক্যাথোড থেকে এবং তা বিভিন্ন বস্তুর ভেতর দিয়েও চলাচল করতে পারে।

রণ্টগেন-এর এই আবিষ্কারের সংবাদ দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দেখা যায়, এই রশ্মির সামনে একটি হাত ধরলে হাতের ভেতরের হাড়সমূহ স্পষ্ট দেখা যায়। ১৮৯৬ সালে এ ধরনের হাতের প্রথম ছবি প্রকাশিত হয় ফরাসী মেডিক্যাল জার্নাল-এ। ১৯১২ সালে আবিষ্কৃত হয় যে, এই রঞ্জনরশ্মি আসলে অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক-তরঙ্গ। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাধারণত এক সেন্টিমিটারের একশ কোটি ভাগের এক ভাগ থেকে দশ হাজার ভাগ পর্যন্ত হয়।

টমাস আলভা এডিসন

বিদ্যুৎ-শক্তিকে মানুষের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের যাঁরা পথিকৃৎ তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন টমাস আলভা এডিসন। এডিসন ছিলেন আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানে অন্যতম প্রধান আবিষ্কারক। এডিসনের জন্ম আমেরিকায়, ১৮৪৭ সালে। তাঁর পিতার অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিল। ছোটবেলায় বাড়ির আশেপাশে শাকসব্জির চাষ করে এডিসন একবার এক বছরে প্রায় ৩০০ ডলার জমিয়েছিলেন। এ থেকে অর্ধেক



তিনি তাঁর মাকে দেন আর বাকি ১৫০ ডলার দিয়ে ক্রয় করেন নানা-রকম রাসায়নিক। এ সব রাসায়নিক নিয়ে তিনি তখন থেকেই নানা-রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে শুরু করেন। এছাড়া এডিসন ট্রেনে খবরের কাগজও বিক্রি করতেন। তারপর এডিসন রেল কোম্পানীর

অনুমতি নিয়ে ট্রেনের মালগাড়িতে হাতেচালানো প্রেস-এর সাহায্যে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 'গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক হেরাল্ড' নামের এই পত্রিকাটির তিনি ছিলেন মুদ্রক, প্রকাশক, কম্পোজিটার, সম্পাদক, রিপোর্টার এবং বিক্রেতা। এ সময় ট্রেনের ঐ মালগাড়িতে অবসর সময়ে তিনি তাঁর রাসায়নিক পরীক্ষাও চালাতেন। একবার ট্রেনের মেঝেতে কিছু ফসফরাস পড়ে গিয়ে ট্রেনটিতে আগুন ধরে যায়। ট্রেনের চালক তখন গাড়ি থামিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলেন। তারপর তিনি এডিসনের ছাপার মেশিন ও সব রাসায়নিক ছুঁড়ে ফেলে দেন বাইরে। আর এডিসনের গালে জোর এক চড় মেরে তাঁকেও নামিয়ে দেন ট্রেন থেকে। এ ঘটনার সঙ্গেই এডিসনের সাংবাদিকতার ইতি ঘটে।

এরপর এডিসন স্টেশনমাস্টারের ছেলেকে চলন্ত ট্রেনের নিচে পড়ার সময় বাঁচিয়ে সহকারী টেলিগ্রাফিস্টের চাকরি পান। এই টেলিগ্রাফের প্রতি ছিল তাঁর দারুণ কৌতূহল। ১৮৬৮ সালে এডিসন ভোট রেকর্ড করার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৮৭৭ সালে আবিষ্কার করেন 'ফোনোগ্রাফ'। এই ফোনোগ্রাফই পরে 'গ্রামোফোন' নামে পরিচিত হয়। গ্রামোফোন রেকর্ডে মানুষের প্রথম যে কথাটি রেকর্ড করা হয় সেটি ছিল একটি ছড়া, 'মেরী হ্যাড এ লিটল ল্যাম্ব'।

এডিসনের সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কার হচ্ছে বৈদ্যুতিক বাতি। অবশ্য এডিসনের পূর্বেই ইংল্যাণ্ডে বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কৃত হয়। তখন খুব সূক্ষ্ম প্লাটিনাম তার এবং কাগজ থেকে তৈরি কার্বনের সুতো বাতির ফিলামেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এডিসন তাঁর নিরলস সাধনার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক বাতির সংস্কার করেন। ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তিনি এই কাজ শুরু করেন এবং প্রায় এক বছর পর অর্থাৎ ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাসে তিনি এতে সাফল্য লাভ করেন। সুতোর ফিলামেন্ট দ্বারা তৈরি তাঁর এই বাতি এক নাগাড়ে জ্বললো প্রায় পঞ্চাশ ঘণ্টা। এবার এডিসন অনুসন্ধান চালালেন আগের চেয়ে অনেক বেশি খুঁটিনাটি নিয়ে। কাচের বাল্বের মধ্যে লাগানোর আগে সবরকমের তন্তুকেই এবার চুলোয় পুড়িয়ে কার্বন করে নেয়া হলো।

হাতের কাছে যা কিছু পাওয়া গেল সবই পরীক্ষা করে দেখা হতে লাগলো। টিস্যু কাগজ, ড্রয়িং কাগজ, আলকাতরা আর ভুষাকালি মাখানো সুতো, মাছ ধরার সুতো, কাঠের টুকরো, নারকেলের ছিবড়ে, প্রদীপের সলতে—বাদ গেলোনা কিছুই।

আর নতুন এই বিদ্যুৎ-বাতি বিক্রি করার জন্য এডিসন নির্মাণ করলেন বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসানো হলো এজন্যে। কিন্তু এতো কাজের মধ্যেও প্রথম শ্রেণীর ফিলামেন্ট অনুসন্ধানের কাজ অব্যাহত রইলো। তারপর প্ল্যাটিনামের ফিলামেন্ট ব্যবহার করে এডিসন আশ্চর্য ফল পেলেন।

টমাস এডিসনের আবিষ্কারের ফলে আলোর পথে মানুষের অভিযাত্রার সর্বশেষ ও সুদৃঢ় পদক্ষেপ পড়লো। এডিসনের পর ডঃ ডব্লিউ আর হুইটনী বিদ্যুৎ-বাতির উন্নয়নের জন্যে গড়ে তুলেছিলেন বিরাট এক ল্যাবরেটরী। একদিন ভুল করে ফিলামেন্ট দু'বার পোড়ানো হলো, এতে আলো হলো আরো উজ্জ্বল। এই ফিলামেন্ট স্থায়ী হলো আরো অনেক বেশি। ১৯১০ সালের দিকে এই বাতি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এরপর ডঃ ডব্লিউ ডি কুলিজ টাঙ্গস্টেনকে সরু তারে পরিণত করার একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। এতে আলো পাওয়া গেলো আরো ভালো, বিদ্যুৎ-খরচও গেল কমে। এই আবিষ্কারের পর কার্বন বিদায় নিলো, তার জায়গা দখল করলো টাঙ্গস্টেন। কার্বনের হলদে আলোর জায়গা দখল করলো টাঙ্গস্টেন-এর সাদা আলো।

এভাবে বিদ্যুৎ-বাতির উন্নতি সাধনের জন্যে বহু লোক তাঁদের দক্ষতা ও সাধনা কাজে লাগিয়ে গেছেন। ডঃ আরভিং ল্যাঙ্গ বাল্বে শূন্যতার বদলে চাপের ব্যবহার করেন প্রথম। আর তিনিই সরু তারকে বাঁকিয়ে চাকতির মতো করেন এই চাপ সহ্য করার জন্যে। এর পর বাল্বের মধ্যে আরগন আর নাইট্রোজেন গ্যাস ভরে দিয়ে আরো সুন্দর আলো পাওয়া গেল।

আজকাল ফ্লোরোসেন্ট বাতির ব্যবহার খুব বেড়ে গেছে। এতে আলো ঠাণ্ডা হয়, বাল্ব উত্তপ্ত হয় কম। এ সব বাতি হয় লম্বা টিউবের মতো। আমরা এগুলোকে টিউব-লাইট বলে থাকি।

আর বিদ্যুতের এই ব্যবহার শুধু আলো জ্বালানোর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই আজ। আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা বিদ্যুতের ব্যবহার করে থাকি। মোটকথা, আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রা আজ সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল এই বিদ্যুতের ওপর। ফলে একদিন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকলেই আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রায় অচল হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের যন্ত্রেও ঘটে গেছে বিরাট পরিবর্তন। আমরা চাই কম খরচে বেশি বিদ্যুৎ। তারই জন্যে বিজ্ঞানীরা আজো গবেষণা করে চলেছেন। আর এখন বিদ্যুৎ-উৎপাদনের প্রকল্প-গুলো হচ্ছে বিরাট। এতে বহুলোক কাজ করে বহুভাবে, যেন সন্ধানী মানুষের বিরাট কর্মশালা।

বিদ্যুৎ-উৎপাদনের আধুনিকতম উপায় হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ-উৎপাদন। এ সব কেন্দ্রকে বলা হয় পারমাণবিক তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র। কিন্তু এর কথা জানার আগে আমাদের জানতে হবে পরমাণুর জগতকে। সেই পরমাণুর জগত আবিষ্কারের কাহিনী বিজ্ঞানের অভিযানের আরেক বিস্ময়কর কাহিনী।

দশম পরিচ্ছেদ

পদার্থের অণু-তত্ত্ব

ফরাসী বিজ্ঞানী লাভোয়াসিয়ে ছিলেন আধুনিক রসায়নের জনক। ড্যাল্টন দিয়েছিলেন রসায়নের আণবিক তত্ত্ব। আমরা জানি, তাঁদের হাতেই শুরু হয়েছে রাসায়নিক বিশ্লেষণের নতুন অধ্যায়। আর এ থেকেই রসায়নবিদরা প্রথম পদার্থসমূহের আণবিক গঠন-প্রণালী নিয়ে গবেষণার সুযোগ পান। এই গবেষণায় যুগান্তর আনেন এভোগাড্রো। এভোগাড্রোই প্রথম মৌলসমূহের বিক্রিয়ার আণবিক বিশ্লেষণ প্রদান করেন।

জন ড্যাল্টন পরমাণুর আপেক্ষিক ওজনের ওপর ভিত্তি করে রাসায়নিক যোজনের নিয়মাবলী নির্দেশ করেন। গে-লুসাক তাঁর গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় সুপারিশ করেন যে, গ্যাসের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে, তবে এখানে তা প্রয়োগ করতে হবে গ্যাসের আয়তনের হিসেবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কিছু নতুন সমস্যা দেখা দেয়। ইতালীয় রসায়নবিদ আমাদিও এভোগাড্রো এসব সমস্যার সমাধান করেন। তিনি বলেন যে, এক্ষেত্রে পরমাণুর সংখ্যাই হিসেব করতে হবে, গ্যাসের আয়তন নয়। এভাবেই গ্যাসসমূহের যোজনের সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

এভোগাড্রো

এভোগাড্রোর জন্ম ১৭৭৬ সালে। ১৮১১ সালে এভোগাড্রো দেখলেন, যদি কল্পনা করা যায় যে গ্যাসের পরমাণু একা যায়না, যায় জোড়ায় জোড়ায়, তাহলে গে-লুসাকের অসুবিধা আর থাকেনা। এভোগাড্রো গ্যাসের পরমাণুর এই জোড়ার নাম দিলেন মোলিক্যুল।

এবার এভোগাড্রো সুপারিশ করলেন যে, সব গ্যাসের সমান আয়তনে সমসংখ্যক মোলিক্যুল থাকে। অর্থাৎ যে-কোনো গ্যাসই হোকনা কেন, সমান আয়তনের গ্যাসে সমান মোলিক্যুল থাকবেই। এভোগাড্রো-র এই সুপারিশ 'এভোগাড্রোর হাইপোথিসিস' নামে

পরিচিত হয়। কিন্তু পরে এই সূত্র অত্যন্ত সফল বলে প্রমাণিত হয়। তখন এটাকে এভোগাড্রোর সূত্র বলা হয়। ১৮৫৬ সালে এভোগাড্রো পরলোক গমন করেন।

জৈব রসায়নের যুগ : লী'বিগ

এদিকে ততদিনে রসায়নে শুরু হয়েছে জৈব রসায়নের যুগ। উনিশ শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী রসায়নবিদ হলেন জাস্টাস ফন লী'বিগ। তাঁর জন্ম ১৮০৩ সালে, জার্মানীতে।

লাভোয়াসিয়ে জৈব যৌগিক পদার্থে কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন-এর শতকরা হার বের করতে সক্ষম হন। লী'বিগ বিশ্লেষণের এই পদ্ধতির আরো উন্নতি সাধন করেন।

ছোটবেলায় স্কুলের জিমন্যাসিয়ামের রেক্টর একবার লী'বিগকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বড় হলে তিনি কি করবেন। লী'বিগ উত্তর দেন যে, তিনি রসায়নবিদ হবেন। তাঁর উত্তর শুনে ক্লাসে হাসির ঝড় বয়ে গেলো, হো হো করে হাসতে শুরু করলো সবাই। হ্যাঁ, ভবিষ্যতের রসায়নবিদের কোনো চিহ্নই ছিলনা স্কুলের এই হাঁদারাম ছেলেটির মধ্যে। সে সময় একবার একটা পরীক্ষা করার সময় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে লী'বিগ ঘরের জানালা পর্যন্ত উড়িয়ে দেন। ফলে জার্মানীর কোথাও তিনি রসায়নচর্চার তেমন ভালো কোনো সুযোগ পাননি। অবশেষে প্যারিসে গে-লুসাকের ব্যক্তিগত গবেষণাগারে কাজ করার অনুমতি পান তিনি। এরপর গীসেন-এর জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে লী'বিগ রসায়নচর্চার এক কেন্দ্র গড়ে তোলেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা আসতো এখানে পড়ার জন্যে। রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে লী'বিগ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

সুইডিশ রসায়নবিদ ফ্রেডারিক ওহলার (১৮০০-১৮৮২)-এর সাথে লী'বিগ-এর খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। ওহলার স্টকহোম-এ বার্জেলিয়াস-এর ব্যক্তিগত গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তারপর তিনি গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। ওহলার লী'বিগকে প্রস্তাব করেন যে, তাঁরা দু'জনে হয়তো এক সঙ্গে কাজ করতে পারেন। আর এই দু'জন রসায়নবিদের যৌথ প্রয়াসে গড়ে ওঠে জৈব রসায়নের মূল ভিত্তি।

ভেলেন্সীর তত্ত্ব

১৮৭২ সালে লী'বিগ-এর প্রাক্তন ছাত্র এডওয়ার্ড ফ্রাংকল্যাণ্ড (১৮২৫-৯৯) প্রথম রাসায়নিক মৌলসমূহের 'ভেলেন্সীর' তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন যে, একটি পরমাণুর অন্য একটি পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার নির্দিষ্ট ও সীমিত ক্ষমতা আছে। কখনো কখনো এ ক্ষমতা কিছুটা বেড়ে যায়, কিন্তু সাধারণভাবে তা অপরিবর্তিত থাকে। এই ক্ষমতার নামই ভেলেন্সী। রসায়নের ছাত্র মাত্রই আজ এই ভেলেন্সীর সঙ্গে প্রথম থেকেই পরিচিত হয়।

অগাস্ট কেকুল

জৈব রসায়নের তাত্ত্বিক গবেষণায় সবচেয়ে বিখ্যাত যিনি তাঁর নাম অগাস্ট কেকুল। ১৮২৯ সালে তাঁর জন্ম। কেকুল তাঁর ছাত্রজীবন আরম্ভ করেন গীসেন-এ, আর্কিটেকচার বা বাস্তুকলার ছাত্রহিসেবে। এখানে তিনি লী'বিগের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তারপর রসায়নচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন তিনি।

কেকুল জৈব রসায়নের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তি তৈরি করেন। তিনি ফ্রাংকল্যাণ্ড-আবিষ্কৃত ভেলেন্সীর তত্ত্বকে স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, কার্বনের ভেলেন্সী চার। আর কার্বন পরস্পরের সাথে যোজিত হতে পারে। আমরা জানি, যে-কোনো জৈব যৌগিক পদার্থে অবশ্যই কার্বন থাকবে। কেকুল একই সাথে তুলে ধরেন তাঁর কার্বন-শৃংখলের তত্ত্ব। জৈব রসায়নের এই অসাধারণ অগ্রগতির ফলে ১৮৫৬ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে কৃত্রিম রং শিল্পেও ঘটে প্রভূত উন্নতি। ১৮৫৬ সালে পার্কিনই প্রথম নীলাভ বেগুনী এনিলিন রং আবিষ্কার করেন। এরপর আবিষ্কৃত হয় এনিলিন লাল এবং এনিলিন নীল। এই আবিষ্কারের ফলে রসায়ন শিল্পে ঘটে যুগান্তকারী বিপ্লব। এতে স্পষ্টই জানা গেল, এরপর মানুষের আর প্রাকৃতিক রং-এর উপর নির্ভর করার প্রয়োজন থাকবে না। এবার মানুষের প্রয়োজনীয় রং তৈরি করা যাবে রসায়নবিদের গবেষণাগারেই। অতএব জৈব রসায়নবিদ্‌দের চাহিদা বেড়ে গেলো। রসায়নশিল্পের ঘটলো দ্রুত প্রসার। অন্যদিকে ঔষধ এবং প্রসাধনীও এবার কৃত্রিম রাসায়নিক উপায়ে তৈরি করা শুরু হয়।

জৈব রসায়নের এই যাদুস্পর্শে বিজ্ঞানীদের জন্যে খুলে গেলো নতুন দিগন্ত। বিশ শতকে এর প্রসার ঘটেছে আরো দ্রুত। আমরা আজকাল আমাদের নিত্যদিনের কাজে যে সব জিনিস ব্যবহার করি তার

প্রায় সবই বিরাট বিরাট রাসায়নিক কারখানায় তৈরি। রেয়ন, নাইলন-এর মতো কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার আজ ব্যাপক। আর প্লাস্টিক, ব্যাকেলাইট-এর তৈরি জিনিসপত্র আমরা ব্যবহার করছি প্রতিনিয়ত।

বলা বাহুল্য, জৈব রসায়নের এই অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবনে এসেছে নতুনতর স্বাচ্ছন্দ্য। আর উত্তরোত্তর ঘটছে এই স্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তৃতি। প্রাচীনকালের সেই আলকেমিস্টরা, যাঁরা একদিন কৃত্রিম স্বর্ণ তৈরির জন্যে গবেষণা করেছিলেন অক্লান্তভাবে, তাঁরা তাঁদের স্বপ্নকে সফল করতে পারেননি। কিন্তু আধুনিক রসায়নবিদরা উদ্ধার করেছেন রসায়নের সেই অলৌকিক যাদুদণ্ড। টেস্টটিউবে তাই ঘটছে অবিশ্বাস্য ঘটনা।

পিরিয়ডিক চার্ট : মেণ্ডেলিয়েভ

রসায়ন জগতের আর একজন দিকপাল হচ্ছেন মেণ্ডেলিয়েভ। তিনি ছিলেন তৎকালীন রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক। মেণ্ডেলিয়েভ রসায়নশাস্ত্রে যুগান্তকারী একটি কাজ সম্পাদন করেছিলেন। এটি হচ্ছে তাঁর সেই বিখ্যাত 'পিরিয়ডিক চার্ট' বা 'পর্যায়-সারণী'। এই চার্ট-এ সব মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক গুণাগুণ নির্ণয় করার একটি পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতিকে মেণ্ডেলিয়েভ-এর 'পিরিয়ডিক ল' বলা হয়। মেণ্ডেলিয়েভ তাঁর এই তালিকার সাহায্যে তখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত কিছু মৌলিক পদার্থ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ১৮৭৫, ১৮৭৯ ও ১৮৮৫ সালে মৌল তিনটি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থ বলে প্রমাণিত হয় এবং মৌলগুলির রাসায়নিক গুণাগুণ সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন তাও হুবহু মিলে যায়। মেণ্ডেলিয়েভ-এর এই পদ্ধতি মৌলিক পদার্থসমূহের শ্রেণীকরণের প্রকৃত ভিত্তি। তাঁর এই অবদান অবিস্মরণীয়।

মেণ্ডেলিয়েভে-এর জন্ম সাইবেরিয়ার তোবলস্কে, ১৮৩৪ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি। অনেক ভাই-বোনের মধ্যে মেণ্ডেলিয়েভ ছিলেন সবার ছোট। তাঁর পিতামহ সাইবেরিয়ায় প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং প্রথম খবরের কাগজ বের করেন। তাঁর বাবা ছিলেন স্থানীয় হাই স্কুলের অধ্যক্ষ। মেণ্ডেলিয়েভ যখন খুব ছোট তখন তাঁর বাবা অন্ধ হয়ে যান। ফলে চাকরি থেকে অবসর নিতে হয় তাঁকে। তবে মেণ্ডেলিয়েভ-এর মা ছিলেন খুবই দৃঢ়চেতা ও বুদ্ধিমতী। তিনি একটি

কাচ-কারখানা স্থাপন করে তার আয় দিয়েই কোনরকমে সংসার চালাতে থাকেন।

১৮৪৯ সালে মেণ্ডেলিয়েভ স্কুলের পড়া শেষ করেন। এ সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং মায়ের কাচের কারখানাটিও আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁর মা তখন ছেলেকে নিয়ে মস্কো চলে আসেন। মেণ্ডেলিয়েভ-এর অন্য ভাই-বোনরা তখন নিজ নিজ জীবন গুছিয়ে নিয়েছে। মা'র ইচ্ছে, ছেলেকে মস্কোর কোনো কলেজে ভর্তি করানো। কিন্তু না, মেণ্ডেলিয়েভ মস্কোর কোন কলেজেই ভর্তির সুযোগ পেলেন না। এবার গেলেন পিটার্সবুর্গ। সেখানে বাবার এক প্রভাবশালী বন্ধুর সহায়তায় ভর্তি হলেন একটি কলেজে। কিন্তু এর অল্প কিছুদিনের মধ্যে সব অনুপ্রেরণার উৎস স্নেহময়ী মাকে হারালেন মেণ্ডেলিয়েভ।



এবার মেণ্ডেলিয়েভ-এর একলা চলার পালা। মা'র স্বপ্ন সার্থক করার লক্ষ্যে কলেজের পড়াশোনায় মনোযোগ দিলেন তিনি। পরীক্ষায় হলেন প্রথম। তারপর ফ্রান্স ও জার্মানী থেকে কৃতিত্বের সাথে অর্জন করলেন স্নাতক ডিগ্রী। বিখ্যাত রসায়নবিদ বুনসেনের সাথে কাজ করার সুযোগও লাভ করলেন এই সময়ে। ১৮৬০ সালে কার্লসরুহ্‌তে প্রথম আন্তর্জাতিক রসায়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মৌলের সর্বসম্মত পারমাণবিক ওজন নির্ধারণে কার্লসরুহ্ সম্মেলন বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সম্মেলনেই মেণ্ডেলিয়েভ পারমাণবিক ওজনের ওপর ইতালীয় বিজ্ঞানী ক্যানিজারোর বক্তৃতা শুনে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন।

কার্লসরুহ্ সম্মেলনের পরপরই মেণ্ডেলিয়েভ পিটার্সবুর্গ ফিরে আসেন এবং ১৮৬৬ সালে পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। পারমাণবিক ওজন সম্বন্ধে তাঁর কাজ শুরু হলো এবার।

মৌলিক পদার্থগুলিকে পারমাণবিক ওজনের মানের উচ্চ ক্রমানুসারে সাজিয়ে মেণ্ডেলিয়েভ তাতে এক মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন, সাতটি করে দল নিয়ে সাজানো তালিকায় মৌলগুলির যোজনী পর পর ১, ২, ৩. ৪, ৩, ২, ১—এমনি এক পর্যাবৃত্ত ধারায় পরিবর্তিত হয়। এভাবে মৌলগুলিকে পারমাণবিক ওজনের উচ্চ ক্রমানুসারে সাজিয়ে মেণ্ডেলিয়েভ তাদের যোজনীর পর্যায়ক্রমিক ওঠা-নামা ছাড়াও লক্ষ্য করলেন যে, একইরকম যোজনীবিশিষ্ট মৌলসমূহ একই উল্লম্ব স্তম্ভ বরাবর পড়ে। আবার একই স্তম্ভের মৌলগুলির রাসায়নিক ধর্মেও অনেক মিল থাকে। সারণীতে নির্দিষ্ট ব্যবধান বা পর্যায় পর পর সজ্জিত মৌলসমূহের যোজনী ও অন্যান্য রাসায়নিক ধর্মে মিল আছে বলেই এই সারণীকে 'পর্যায় সারণী' বা 'পিরিয়ডিক টেব্‌ল' বলা হয়। আর ঐ নির্দিষ্ট ব্যবধানকে বলা হয় 'পর্যায়' বা 'পিরিয়ড'।

মেণ্ডেলিয়েভ-এর প্রথম সারণী প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে। প্রকাশের সাথে সাথেই তাঁই এই কাজ বিজ্ঞানীসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু তাঁর কাজটি সাথে সাথে স্বীকৃতি লাভ করেনি। কারণ মৌলগুলিকে যে নির্দিষ্ট কোনো নিয়মে সাজানো সম্ভব, এ সম্বন্ধে অনেকের মনেই ছিল সন্দেহ। কিন্তু মেণ্ডেলিয়েভ এতে দমে না গিয়ে পর্যায় সারণীর আরো উন্নতি সাধন করে চললেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৌলকে পারমাণবিক ওজন অনুসারে নির্দিষ্ট জায়গায় না বসিয়ে অন্যত্র বসালেন, যাতে তা সঠিক সারিতে সঠিক স্তম্ভে পড়ে। তাঁর এই কাজের যুক্তিটি খুঁজে পাওয়া যায় প্রায় চল্লিশ বছর পর, ইংরেজ পদার্থবিদ মোসলে'র কাজের মধ্য দিয়ে। মোসলে দেখান যে, পারমাণবিক ওজন নয়, বরং পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী সাজালেই পর্যায় সারণীতে মৌলগুলির সঠিক অবস্থান পাওয়া যাবে। পারমাণবিক ওজন হচ্ছে মৌলের নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার সমষ্টি আর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে যে কয়টি প্রোটন থাকে তার সংখ্যা।

মনে রাখা প্রয়োজন, পর্যায় সারণীতে মৌলগুলিকে পারমাণবিক সংখ্যার ঊর্ধ্বক্রম অনুসারেই সাজানো হয়।

এভাবে মেণ্ডেলিয়েভ-এর পর্যায় সারণীর মৌলের তালিকায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলো। ১৮৮২ সালে তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ রয়েল সোসাইটি তাঁকে ডেভী পদকে ভূষিত করলো। ১৯০৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি মেণ্ডেলিয়েভ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৫৫ সালে ১০১তম মৌল আবিষ্কৃত হলে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মৌলটির নাম দেওয়া হয় মেণ্ডেলেভিয়াম।

কিন্তু শুধু কি পদার্থবিদ্যা আর রসায়ন? না, শুধু তা নয়। অষ্টাদশ আর উনবিংশ শতাব্দীতে সারা ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় বিজ্ঞানের সকল শাখায় অগ্রাভিযানের যে মিছিল শুরু হয়েছিল আজো তা স্তিমিত হয়নি এতটুকু। উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি প্রায় সব শাখাতেই ঘটেছে যুগান্তকারী আবিষ্কার। এ সময়কার বিখ্যাত সব আবিষ্কারের অধিকাংশ হয়েছে ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানী ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিজ্ঞানীরা প্রায় প্রত্যেকেই কাজ করেছেন স্বতন্ত্রভাবে। কিন্তু জার্মানীতে বিজ্ঞানকে সার্বিকভাবে গ্রহণ করা হয়, বিজ্ঞানের উন্নতির পেছনে নিয়োজিত হয় সামগ্রিক প্রচেষ্টা। জার্মানীর গটিংগেন, মিউনিক ও বার্লিনে গড়ে ওঠে বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। আমেরিকা থেকে তখন ছাত্ররা বিজ্ঞান পড়ার জন্যে আসতো জার্মানীতে। আমেরিকার বিজ্ঞানীরাও প্রায়ই জার্মানীতে আসতেন আর জার্মান বিজ্ঞানীরাও যেতেন আমেরিকা ভ্রমণে। আমেরিকার বিজ্ঞানচর্চায় তাই এই জার্মান ধারার প্রভাবই বেশি লক্ষ্য করা যায় এখনো। বস্তুত পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যার ক্ষেত্রে যেমন ইংল্যাণ্ড ছিল অগ্রণী, তেমনি রসায়ন ও ভেষজবিদ্যায় জার্মান বিজ্ঞানীদের অগ্রগামিতা ছিল সন্দেহের অতীত।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিপ্লব : লুই পাস্তুর

পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে নিত্যনতুন আবিষ্কারের সাথে চিকিৎসাবিজ্ঞানেও দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিলো। এবার চিকিৎসকদের সহায়তায় এগিয়ে এলো আধুনিক বিজ্ঞান, রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা যেমন আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে সক্ষম হলেন তেমনই রোগ নিরাময়ের জন্যে ঔষধ তৈরির কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হলো রসায়নবিদ্যার নতুন অবদান। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে যাঁর নাম

সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তিনি ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর। তাঁকে 'রোগ-জীবাণু-তত্ত্ব'র জনক নামে অভিহিত করা হয়। লুই পাস্তুরই প্রথম প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, মানুষের অথবা জীবজন্তুর নানা রকম অসুখের কারণ হচ্ছে রোগজীবাণু। এই রোগজীবাণু দেহে প্রবেশ করলে এবং তা প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেই মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তিনি বলেন যে, রোগজীবাণু নিয়ে গবেষণার দ্বারাই রোগ প্রতিরোধ



এবং রোগ নিরাময় সার্থক করা যাবে। অবশ্য লুই পাস্তুর এই রোগ-জীবাণু-তত্ত্বের প্রকৃত উদ্ভাবক নন। তাঁর একশো বছর আগে অস্ট্রীয় বিজ্ঞানী এম. প্রেন্সিজই প্রথম বলেন যে, অসুখের কারণ হচ্ছে জীবাণু বা রোগজীবাণু। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করেন চিকিৎসকরা। লুই পাস্তুর তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন যে, আসলে বিজ্ঞানী প্রেন্সিজ-এর বক্তব্যই সঠিক। ১৮৮১ সালে ৫০টি মেষ নিয়ে এক পরীক্ষাকার্য চালিয়ে পাস্তুর তাঁর বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করেন। ১৮৮৫ সালে পাস্তুর তাঁর এই নতুন চিকিৎসা-রীতি প্রয়োগ করলেন একটি বালকের উপর। মানুষের ক্ষেত্রে এটাই ছিল তাঁর প্রথম পরীক্ষা। তিনি মৃত্যুপথযাত্রী বালকটিকে বাঁচাতে সক্ষম হলেন।

লুই পাস্তুরের জন্ম ১৮২২ সালে। ১৮৯৫ সালে ৭৩ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

রবার্ট কখ

রোগজীবাণু-তত্ত্বে পাস্তুরের জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন জীবাণুতত্ত্ববিদ রবার্ট কখ। জার্মানরা তাঁকেই রোগজীবাণু-তত্ত্বের জনক বলে অভিহিত করেন। অবশ্য একথা ঠিক যে, কখ রোগজীবাণু গবেষণার অপরিহার্য যন্ত্র 'অণুবীক্ষণ যন্ত্রে'র প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং রোগজীবাণু নিয়ে তাঁর গবেষণা ছিল অনেক বেশি ব্যাপক। কিন্তু রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগে তিনি পাস্তুরের মতো সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি।

কখ কলেরা ও যক্ষ্মারোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। তাঁর কলেরা জীবাণু আবিষ্কার এক বিস্ময়কর কাহিনী। ১৮৮৩ সালে মিসরে মহামারী আকারে কলেরা দেখা দেয়। ফলে ইউরোপেও কলেরার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় পাস্তুর ও কখ দু'জনেই এর কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কখ একজন সহকারী ও অণুবীক্ষণ প্রভৃতি নিয়ে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে উপস্থিত হলেন। পাস্তুর নিজে তখন জলাতঙ্ক রোগের কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তিনি পাঠালেন তাঁর দুই সহকারী রাউক্স্ ও থুইলিয়ারকে। দু'দলই পৃথকভাবে কাজ শুরু করল। কিন্তু কলেরা মহামারী যেমন প্রায় হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি প্রায় হঠাৎই বন্ধ হয়ে এলো। দুই সন্ধানী দলই তখন যে যার দেশে ফেরার উদ্যোগ নিচ্ছে, এমন সময় একদিন থুইলিয়ারের কলেরা হল, আর তিনি তাতেই মারা গেলেন। এদিকে কখ কলেরা রোগীর পাকস্থলীতে কমা(,)-র মতো একটি নতুন ধরনের জিনিস লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু তারাই যে কলেরার কারণ সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। মিসরে কলেরা থেমে যাওয়ায় কখ তাঁর অনুসন্ধানের কাজ শেষ করতে পারেন নি। তাই বার্লিনে ফিরে তিনি কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, আরো পরীক্ষার দরকার আর সেজন্য তিনি ভারতবর্ষে যেতে চান, কারণ সেখানে কলেরা লেগেই আছে। কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভারতবর্ষে পাঠাতে রাজি হলেন। থুইলিয়ারের মৃত্যু চোখের উপর দেখেও কখ চলে এলেন এক অজানা ব্যাধিসংকুল দেশে। ভারতে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কখ তাঁর কাজ শুরু করলেন। কলকাতায় কখ তেমন বেশিদিন ছিলেন না, কিন্তু বহু পরীক্ষার পর তিনি সুনিশ্চিত হলেন যে, কমা জীবাণুরাই কলেরার কারণ। দেশে ফিরে

গিয়ে তিনি জানালেন যে, অই 'কমা' জীবাণু যদি পেটের মধ্যে না যায়, তাহলে কোনো সুস্থ লোকেরই কলেরা হতে পারে না।

রবার্ট কখ-এর জন্ম ১৮৪৩ সালে। ১৯১০ সালে ৬৭ বছর বয়সে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। জীবাণুকে রক্ত থেকে পৃথক করা, তাদের বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন ইত্যাদি কখ-এর অসাধারণ অবদান। এজন্য কখকে জীবাণুবিদ্যার জনক বলা হয়।

জোসেফ লিস্টার

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোচনায় আরেকটি নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি বৃটিশ বিজ্ঞানী জোসেফ লিস্টার। জন্ম তাঁর ১৮২৭ সালে, লুই পাস্তুরের জন্মের পাঁচ বছর পর। লিস্টার প্রথম থেকেই 'রোগ-জীবাণু তত্ত্ব'কে সঠিক বলে মনে করতেন। আর তিনি এই জীবাণুর বিরুদ্ধেই শুরু করেন তাঁর রাসায়নিক যুদ্ধ। তাঁর সময়ে অপারেশন সফল হলেও অনেক রোগী কিন্তু মৃত্যুবরণ করতো প্রধানত এই অপারেশনের ফলেই। এটা হতো ঘা দুষিত হয়ে পচন ধরার কারণেই।

লিস্টার নিজে পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। ১৮৬০ সালে তিনি গ্লাসগোয় সার্জারির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে ১৮৭৭ সালে তিনি লণ্ডনে ফিরে আসেন এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে। লিস্টার অপারেশনের ফলে সৃষ্ট পচন বন্ধ করার জন্যে 'অ্যান্টি-সেপটিক' ব্যবহারের কথা বলেন প্রথম। আর কার্বলিক এসিড এতে ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়। আজকাল আমরা সবার ঘরেই 'ডেটল' বা 'স্যাভলন' ইত্যাদি 'অ্যান্টি-সেপটিক' রাখি। 'অ্যান্টিসেপটিক'-এর ব্যবহার শুরু হওয়ার পর অপারেশনের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমে যায়।

কোষতত্ত্ব

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে জীববিজ্ঞানে যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল তা হচ্ছে—কোষতত্ত্ব ও বংশগতিবিদ্যা। এর আগে হল্যাণ্ডের জ্যান্স ও জ্যাকারিয়াস অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন ১৫৯০ সালে। কোষবিদ্যার গবেষণা সূচিত হয় বৃটিশ গণিতবিদ রবার্ট হুকের হাতে। তিনিই প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একটি সাধারণ কর্কের অতি সূক্ষ্ম অংশ পর্যবেক্ষণ করেন ১৬৬৫ সালে। অণুবীক্ষণে দেখা গেল, কর্কটির মধ্যে রয়েছে মৌমাছির চাকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মতো অসংখ্য

প্রকোষ্ঠ। এসব প্রকোষ্ঠকে তিনি সেল বা কোষ নামে অভিহিত করেন। বস্তুত কোষবিদ্যার সূচনাও ঘটে এই ঘটনা থেকেই। এরপর ১৬৭৪ সালে হল্যাণ্ডের আণ্টন ভ্যান লিউভেনহুক আরো উন্নত ধরনের একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করেন, যার সাহায্যে যে কোনো বস্তুকে ২৭০ গুণ বড় করে দেখা সম্ভব ছিল। লিউভেনহুক ছেলেবেলায় এক কাপড় বিক্রেতার সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল আতস কাচ দিয়ে সুতা পরীক্ষা করে দেখা। তখন থেকেই কাচ ঘষে আতস কাচ প্রস্তুত করা ছিল তাঁর অন্যতম পেশা। এই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উচ্চতর বিবর্ধন শক্তিসম্পন্ন লেন্স বা পরকলা তৈরি করতেন। এভাবেই একসময় তিনি তাঁর প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি নির্মাণ করেন। তারপর একাদিক্রমে তিনি ৫০টি অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করেন। এসব যন্ত্রের সাহায্যেই তিনি সর্বপ্রথম বিস্ময়কর আণুবীক্ষণিক জীবজগত আবিষ্কার করেন। এর ফলেই তিনি ব্যাকটিরিয়া; রক্তকোষ, শুক্রাণু প্রভৃতির অত্যন্ত নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করে বিবরণসহ বৃটিশ রয়েল সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশ করেন। লিউভেনহুক প্রকৃত অর্থে কোষবিদ ছিলেন না এবং তিনি কোষ সম্পর্কে কোনো তত্ত্বও উদ্ভাবন করেন নি। কিন্তু আণুবীক্ষণিক জীবজগত সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন বিবরণ ও উল্লেখ কোষ-বিদ্যার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

লিউভেনহুক-এর পর ১৮০৫ সালে দ্য লেমার্ক জীবদেহের গঠন সম্পর্কে কোষের অস্তিত্ব সমর্থন করে বলেন যে, জীবনের অস্তিত্বের জন্য কোষ বা কোষ-কলা দ্বারা জীবদেহ গঠিত হওয়া আবশ্যক এবং তা না হ'লে জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব।

থিয়োডোর শোয়ান ও জ্যাকব স্লাইডেন

কোষ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাকে তত্ত্বে রূপায়ণের কৃতিত্ব দু'জন জার্মান বিজ্ঞানীর। এ দু'জন হলেন থিয়োডোর শোয়ান এবং ম্যাথিয়ুস জ্যাকব স্লাইডেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে তাঁরা দু'জন কোষ-তত্ত্বকে জীববিজ্ঞানের আলোকে চূড়ান্ত সংগঠিত ও সংশ্লেষিত রূপ হিসেবে দাঁড় করান, যা পরবর্তীকালে ডারুইনের বিবর্তনবাদের সমপর্যায়ের কীর্তিরূপে গণ্য হয়। কোষের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে, দেহের সংঘটন ও বিকাশের ক্ষেত্রে কোষ একটি গঠনগত ও কার্যগত একক। তবে ১৯৩৮ সালে জি. জে. মুল্ডার কোষের রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে বলেন যে, কোষের গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক গঠন-উপাদান হচ্ছে প্রোটিন।

ফরাসী বিজ্ঞানী দুজারদিন ১৮৩৫ সালে জীবকোষে প্রোটোপ্লাজমের কথা প্রথম উল্লেখ করেন। প্রোটোপ্লাজম হচ্ছে কোষের মধ্যে জেলির মতো স্বচ্ছ একটি পদার্থ। আর প্রোটোপ্লাজম-এর মধ্যে আছে ঘনতর পদার্থের একটি বিন্দু, যার নাম নিউক্লিয়াস। রবার্ট ব্রাউন ১৮৩৫ সালে সর্বপ্রথম কোষে নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। কোষে প্রোটো-প্লাজম ও নিউক্লিয়াস থাকে একটি আবরণের মধ্যে। এই আবরণের নাম কোষ-প্রাচীর। তবে এই আবরণটি উদ্ভিদের কোষে যতখানি স্পষ্ট, প্রাণীর কোষে ততখানি নয়। ১৮৪৮ সালে হফমাইস্টার নিউক্লিয়াসে সুতার মতো একটি বস্তু সনাক্ত করতে সমর্থ হন। পরবর্তীকালে ১৮৮৮ সালে ওয়ালডেয়ার এই বস্তুটিকে ক্রোমোসোম নামে অভিহিত করেন। সাধারণ একটি কোষের মাপ হয়ে থাকে এক মিলিমিটারের একশো ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ এক ইঞ্চির আড়াই হাজার ভাগের এক ভাগ। কিন্তু এই অতি ক্ষুদ্র কোষটিই হচ্ছে জীবদেহের যাবতীয় কাজের মূল। কারণ, প্রতিটি জীবের শারীরবৃত্তিক কাজের জন্য যে শক্তির দরকার, তা তৈরি হয় কোষের ভিতরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে। অতএব কোষকে একটি অণুজাগতিক রাসায়নিক কারখানাও বলা যায়। কিন্তু এই অসামান্য রকমের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে যে-সব জটিলতম রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটে থাকে তা আজ পর্যন্ত কোনো গবেষণাগারেই হুবহু নকল করা সম্ভব হয়নি। অতএব কোষ হচ্ছে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে অতি বৃহৎ ও অতি জটিল একটি রাসায়নিক কারখানা।

একটি থেকে দু'টি

এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, চার থেকে আট—এমনিভাবে সব-সময় কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়ে চলে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রথমে দেখা যাবে, সুতার মতো ক্রোমোসোমগুলি ক্রমেই হয়ে ওঠে বেঁটে ও মোটা আর বিন্যস্ত হয় কোষের মাঝ-বরাবর। এবার প্রত্যেকটি ক্রোমোসোম দু-ভাগ হয়ে যায়। এক থাকলে দুই, দুই থাকলে চার, তিন থাকলে ছয়—এমনিভাবে ক্রোমোসোমের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে চলে। ইতোমধ্যে নিউক্লিয়াসের বাইরেও এই টানা-পোড়েন শুরু হয়। ফলে ক্রোমোসোমগুলি দুটি ঝাঁকে ভাগ হয়ে যায়। এই অবস্থায় কোষের মাঝ-বরাবর তৈরি হয় একটি পর্দা। তখন একটি কোষ দুটি হয়ে যেতে আর কোনো বাধা থাকে না।

একটি কোষের দুটি হওয়ার এই প্রক্রিয়াকে বলে মাইটোসিস।

জিন

নানা রঙের পুঁতি দিয়ে গাঁথা একটি মালার সাথে তুলনা করা যায় ক্রোমোসোমকে। পুঁতিগুলোকে নানাভাবে সাজিয়ে নানারকম চেহারার মালা পাওয়া যেতে পারে। ক্রোমোসোমের পুঁতিগুলো হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম কতগুলো কণিকা, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে জিন। কোষের ক্রিয়াকাণ্ড কেমন হবে তা যেন জিনের অক্ষরে লেখা হয়ে আছে। ক্রোমোসোমের মধ্যে মালার মতো সাজানো জিনের সংখ্যা ও গঠন থেকেই বোঝা যাবে, জীবের আকৃতি-প্রকৃতি কেমন হবে। একই বাপ-মায়ের সন্তান-সন্ততি যে একই রকমের হয়ে থাকে তার মূলে আছে এই জিন। এই কারণে জিনকে বলা হয়ে থাকে জীবের বংশগতির উপকরণ। প্রত্যেকটি জিন আগের বংশ থেকে এই উপকরণ লাভ করে এবং পরের বংশকে এই উপকরণটি দিয়ে যায়। সাধারণত এই উপকরণটির মধ্যে কোনো অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায় না। ফলে বংশ থেকে বংশে সাদৃশ্য বজায় থাকে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরী

কেমব্রিজের বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয় ১৮৭৪ সালে। প্রথমদিকে এই ল্যাবরেটরির পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এবং লর্ড রেলী প্রমুখ। লর্ড রেলীর পর ১৮৮৫ সালে জে. জে. থমসন ক্যাভেণ্ডিশ প্রফেসর নিযুক্ত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৮ বছর। এত অল্প বয়সে এ-ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অন্য কেউ আর নিযুক্ত হননি। এ সময় কলেজের একজন অধ্যাপক বিদ্রূপ করে মন্তব্য করেন, আজকাল অপোগণ্ড বালকরাও প্রফেসর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, জে. জে. থমসনের পরিচালনাধীনেই ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরি বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত গবেষণাগারে পরিণত হয়। থমসনের যোগদানের এগারো বছর পর অর্থাৎ ১৮৯৫ সালে রন্টগেন 'এক্স-রে' আবিষ্কার করেন। এদিকে ঐ বছরই রাদারফোর্ড এসে যোগদান করলেন ল্যাবরেটরিতে। তিনি এলেন নিউজিল্যাণ্ড থেকে। ডাবলিন থেকে এলেন টাউনসেণ্ড। শুরু হলো ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরির স্বর্ণযুগ।

স্যার জোসেফ জন থমসন ১৮৫৬ সালে মাঞ্চেস্টারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লেখাপড়া করেন কেমব্রিজে। আর ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরিতে যোগদানের পর তিনি স্যার উইলিয়াম ক্রুকস আবিষ্কৃত ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। থমসন তাঁর গবেষণার মাধ্যমে ক্যাথোড রশ্মির প্রকৃতি নির্ণয় করতে সক্ষম হন। তিনি দেখেন যে, ক্যাথোড রশ্মি আসলে দ্রুত প্রবহমান কণিকা। এই কণিকাসমূহই এখন ইলেকট্রন নামে পরিচিত। আর আমরা জানি, ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ আসলে দ্রুত বহমান ইলেকট্রন। বিভিন্ন ধরনের ক্যাথোড ব্যবহার করে থমসন দেখলেন, এটম তথা পরমাণু যাই হোকনা কেন, সব ইলেকট্রন আসলে একই রকম। থমসন ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ ও ওজন বের করতেও সক্ষম হন। ইলেকট্রন ঋণাত্মক। এ থেকে থমসন চিন্তা করেন, যে সব ধাতু থেকে

ঋণাত্মক ইলেকট্রন খসে পড়ে সেসব ধাতু অবশ্যই ধনাত্মকভাবে চার্জ হয়। আর ধনাত্মক চার্জও আসলে অনুরূপ ক্ষুদ্র কণিকা। রাদারফোর্ড এই ধনাত্মক ক্ষুদ্র কণিকাও আবিষ্কার করেন।

কিন্তু রাদারফোর্ডের কাহিনী বলার আগে আমাদের একবার তেজস্ক্রিয়তার কাহিনী জানা প্রয়োজন। কেননা, তেজস্ক্রিয়তার কাহিনী না জানলে পারমাণবিক জগতের কাহিনীর কিছুই জানা যাবে না।

আঁরি বেকেরেল

ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী আঁরি বেকেরেলই প্রথম তেজস্ক্রিয়ার বিষয়টি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। ১৮৯৬ সালের গোড়ার দিকে কয়েকটি অনুপ্রভ বা 'ফসফরেসেন্ট' পদার্থ নিয়ে গবেষণা করার সময়ই তিনিই প্রথম ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন। ঘটনাচক্রে একদিন তিনি দেখলেন যে, অনুপ্রভ ইউরেনিয়াম লবণের টুকরোটি আলোর সামনে ধরার পর কেবল আলোকই বিকিরণ করছে না, বরং তা থেকে এক ধরনের রশ্মিরও বিকিরণ ঘটছে। তিনি দেখলেন, পুরু কাগজ মুড়ে রাখলেও এই রশ্মির বিকিরণ ঘটে। অথচ সাধারণ আলো এত পুরু কাগজ ভেদ করতে পারে না। এর ক'দিন পর বেকেরেল আরও দেখলেন যে, রোদ বা আলোর সামনে ধরা না হলেও ইউরেনিয়াম আরো বেশি ভেদ-ক্ষমতাসম্পন্ন রশ্মি বিকিরণ করতে পারে এবং অনেকক্ষণ ধরেই রশ্মি বিকিরণের এ ক্ষমতাটি অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ ইউরেনিয়াম লবণের রশ্মি বিকিরণের ব্যাপারটি স্বতঃস্ফূর্ত। বেকেরেল এ ব্যাপারটি নিয়ে আরো কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। এবার তিনি ইউরেনিয়াম আছে এমন সব পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। তিনি দেখলেন, এধরনের সব পদার্থের বিকিরণই স্বতস্ফূর্ত।

বেকেরেলের ধারণা ছিল, ইউরেনিয়াম লবণের এই স্বতস্ফূর্ত রশ্মি আসলে এক্সরে বা সে ধরনের কোনো রশ্মি। তিনি ভুলেও চিন্তা করতে পারেন নি যে, আসলে এই রশ্মি হচ্ছে তেজস্ক্রিয়া আর তা তেজস্ক্রিয় পদার্থেরই স্বাভাবিক ধর্ম।

বেকেরেলের জন্ম ১৮৫২ সালে। তাঁর পুরো নাম আন্তনে আঁরি বেকেরেল। বেকেরেল যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে পরিবারের বিজ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য ছিল। তাঁর পিতামহ আন্তনে সিজার তড়িৎ-রসায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের কৃতিত্ব লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে বেকেরেলের পিতা আলেকজাণ্ডার এডমণ্ডও

তড়িৎ-রসায়ন নিয়ে গবেষণা করেন এবং পরে তিনি চুম্বকতত্ত্ব ও আলোক-বিকিরণের ওপর কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। বেকেরেল মূলত তাঁর পিতার অসমাপ্ত কাজেই হাতে দিয়েছিলেন আর এভাবেই তিনি তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কার করেন। আঁরি বেকেরেল শিক্ষালাভ করেন প্যারিসের পলিটেকনিক স্কুলে। পরে তিনি 'প্যারিস ন্যাচারেল হিস্ট্রি ম্যুজিয়ম'-এ লেকচারার নিযুক্ত হন। তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কারের কৃতিত্বের জন্যে বেকেরেল ১৯০৩ সালে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। ১৯০৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

মাদাম কুরী

আঁরি বেকেরেল তেজস্ক্রিয়ার সূত্রটি যে আবিষ্কার করলেন, কুরী দম্পতির গবেষণায় তা হলো প্রতিষ্ঠিত। ইউরেনিয়াম ছাড়াও তাঁরা আরো কয়েকটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন। আবিষ্কৃত হলো তেজস্ক্রিয়ার আরো নানা তথ্য।

মেরী কুরীর জন্ম পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ শহরে, ১৮৬৭ সালে। তাঁর পিতা ছিলেন সেখানকার এক স্কুলের বিজ্ঞান-শিক্ষক। এরপর তাঁরা সবাই প্যারিসে চলে আসেন। সেখানে বেশ অর্থকষ্টের সম্মুখীন হন



তাঁরা। মেরী সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিশুর পরিচারিকা হিসেবে কাজ করে যা আয় করতেন তা থেকে কিছু সঞ্চয় করে পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহ করতেন। তারপর তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর মেরী সরবোর্ন-এ গবেষণাগারের সহকারীর কাজ পান। এখানে তিনি পিয়েরে কুরীর অধীনে কাজ করতেন। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পিয়েরে কুরী নিজেও ছিলেন অধ্যবসায়ী আর মেরীর মতোই বিজ্ঞানের সেবায় নিবেদিত-প্রাণ। ১৮৯৫ সালে তাঁরা উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পরিণয়ের পর পিয়েরে ও মেরী একত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে কাজ করতে লাগলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন, থোরিয়াম নামক পদার্থটি ইউরেনিয়ামের মতোই স্বতঃস্ফূর্তভাবে রশ্মি বিকিরণ করে থাকে। অতঃপর একখণ্ড আকরিক ইউরেনিয়াম (পিচব্লেণ্ড) নিয়ে পরীক্ষা করে তাঁরা আরো অনেক বেশি শক্তিশালী বিকিরণ দেখতে পেলেন। এবার তাঁরা কয়েক মাস ধরে গবেষণা চালিয়ে পিচব্লেণ্ড-এর তেজস্ক্রিয় উপাদানটি খুঁজে বের করতে সক্ষম হলেন। মেরী তাঁর জন্মভূমির নামানুসারে পদার্থটির নাম দিলেন পোলোনিয়াম। এরপর তাঁরা আবিষ্কার করলেন রেডিয়াম। রেডিয়ামের বিকিরণের ক্ষমতা পোলোনিয়ামের চেয়ে আরো বেশি। কুরী দম্পতির পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কারের পর অল্পদিনের মধ্যেই অপর কয়েকজন বিজ্ঞানী আরো কয়েকটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পেলেন। ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে প্রকৃতির ভাণ্ডারে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অভাব নেই।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীরা আবার নতুন করে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন। ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে বিকিরণ ঘটে তার কারণ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন তাঁরা, জানতে চাইলেন এই বিকিরণের স্বরূপ কি ! এসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার গবেষণায় যিনি সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করলেন তিনি আর্নেস্ট রাদারফোর্ড।

রাদারফোর্ড

নিউজিল্যাণ্ডের এক খামারবাড়িতে রাদারফোর্ডের জন্ম, ১৮৭১ সালে। সেখানকার এক কলেজেই তিনি পড়াশোনা করেন। কথিত আছে, একদিন মাঠে বসে রাদারফোর্ড মাটি খুঁড়ে আলু তুলেছেন, এমন সময় খবর এলো : ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়নের জন্যে তিনি একটি বৃত্তি পেয়েছেন। তরুণ আর্নেস্টের এ এক মহাভাগ্যই বলতে হয়। কেননা ইংল্যাণ্ডে গিয়ে যাঁর অধীনে তাঁকে পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করতে হবে তিনি ছিলেন তদানীন্তন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী

জে. জে. থমসন। রাদারফোর্ড কেম্ব্রিজে থাকার সময়ই থমসন ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন। ইলেকট্রনের 'বৈদ্যুতিক চার্জ' ও 'ভর' পরিমাপ করার সময় রাদারফোর্ড থমসনকে সাহায্য করেন। এ সময়েই তাঁরা বস্তুর তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হওয়ার সংবাদ পান। আর রাদারফোর্ডের সচেতন মন সঙ্গে সঙ্গেই আকৃষ্ট হলো এদিকে। রাদারফোর্ড তখন কানাডার মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদর্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৭ বছর। মন্ট্রিলে রাদারফোর্ড তাঁর গবেষণার সুযোগ পেলেন। তখনকার দিনের পদার্থবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। রাদারফোর্ড এবার কাজ শুরু করলেন ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণ নিয়ে। কেটে গেলো কয়েক বছর। নানা পরীক্ষার পর রাদারফোর্ড বুঝতে পারলেন, তেজস্ক্রিয় পদার্থের যে বিকিরণ হয়, কয়েক রকমের রশ্মি থেকেই তার উৎপত্তি। তার মধ্যে একটি হলো অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন ও ধনাত্মক বৈদ্যুতিক 'চার্জ' বিশিষ্ট রশ্মিকণার সমষ্টি। এই রশ্মির নাম দিলেন তিনি 'আলফা' রশ্মি' ও কণার নাম 'আলফা কণা'। পরবর্তী পর্যায়ে রাদারফোর্ড দেখতে পেলেন যে, একটা 'আলফা কণা' একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে ৪ গুণ ভারি এবং দু'টি ধনাত্মক চার্জের অধিকারী।

রাদারফোর্ড এরপর ঋণাত্মক চার্জসম্পন্ন আরো একধরনের রশ্মির সন্ধান পেলেন। এই রশ্মির নাম দিলেন তিনি 'বিটা রশ্মি' এবং কণাসমূহের নাম দিলেন 'বিটা কণা'।

এ সময় একজন ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী আবার আরেক রকমের রশ্মি আবিষ্কার করলেন, যার নাম গামা রশ্মি।

বিজ্ঞানীরা এরপর একবাক্যে স্বীকার করলেন যে আলফা, বিটা বা গামা রশ্মির উৎপত্তি পরমাণু থেকে এবং অন্য কিছু থেকে এর উৎপত্তি হতে পারে না।

রাদারফোর্ড এবার তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, যখন কোনা তেজস্ক্রিয় পরমাণু ভেঙে যায় তখন তা থেকে আলফা কণা, বিটা কণা বা গামা রশ্মির বিকিরণ হয়। একথা বলে রাদারফোর্ড বোঝাতে চাইলেন যে, তেজস্ক্রিয় পরমাণু ভেঙে গেলে তা ভিন্ন পরমাণুতে পরিণত হয়। অর্থাৎ এমন কতকগুলো মৌলপদার্থ আছে যা আপনা থেকেই অন্য মৌলপদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে। পরমাণুর এই আপনা-আপনি ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রাদারফোর্ড চিন্তা

করলেন, সাধারণ পরমাণুগুলোকেও নিশ্চয়ই কোনো না কোনো উপায়ে ভাঙ্গা যেতে পারে। তিনি ভাবলেন, আলফা রশ্মি দিয়ে আঘাত করে পরমাণু ভাঙ্গা যেতে পারে। এবারে হাতে-কলমে ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখলেন রাদারফোর্ড। ১৯১৯ সালে আলফা কণা দিয়ে আঘাত করে নাইট্রোজেন পরমাণু ভেঙ্গে অক্সিজেন পরমাণু উৎপন্ন করতে সক্ষম হলেন।

রাদারফোর্ডের এই সাফল্যের পর অন্য বিজ্ঞানীরাও এভাবে পরমাণুর বুকে 'তোপ' দেগে পরমাণু ভাঙ্গতে সক্ষম হলেন। বস্তুত রাদারফোর্ডের এই আবিষ্কার পারমাণবিক গবেষণায় আনলো যুগান্তর। বিজ্ঞানীরা এবার দেখতে পেলেন পরমাণুর গঠন-বিন্যাস। ইতোমধ্যে বিজ্ঞানী সি. টি. আর. উইলসন 'এক্সপানশন চেম্বার' আবিষ্কার করেছেন। এই চেম্বারের সাহায্যে রাদারফোর্ড পরমাণু ভেঙ্গে যে কণাসমূহ বের হয় সেগুলো শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, নাইট্রোজেন পরমাণু ভেঙ্গে যে কণাগুলো ছিটকে বেরিয়ে পড়ে সেগুলো ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট এবং তাদের 'ভর'ও সমান। ১৯১৯ সালে রাদারফোর্ড সম্পূর্ণ সফল হলেন তাঁর এই পরীক্ষায়। এবার তিনি ক্লোরিন, সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ও ফসফরাস নিয়ে একই পরীক্ষা চালালেন। ফল হলো একই রকম। রাদারফোর্ড ছিটকে বেরিয়ে-পড়া কণাগুলোর নাম দিলেন 'প্রোটন'।

রাদারফোর্ড এবার সম্পূর্ণ পরমাণুর গঠন নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন। এর আগে থমসন 'ইলেকট্রন' আবিষ্কার করেছিলেন। এবার ১৯৩২ সালে ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী জেমস শ্যাডউইক বেরিলিয়ামের ওপর আলফাকণার তোপ দেগে দেখলেন, বেরিলিয়াম কণা থেকে যে কণার বিচ্ছুরণ হয়েছে তার 'ভর' হাইড্রোজেন কণার মতই; কিন্তু এর কোনো বৈদ্যুতিক চার্জ নেই। এই পদার্থ-কণার নাম আগেই দেওয়া হয়েছিল 'নিউট্রন'। কারণ নিউট্রন আবিষ্কারের আগেই পদার্থবিজ্ঞানীরা এই নিউট্রনের অস্তিত্ব আন্দাজ করেছিলেন।

এবার বিজ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো পরামাণুর চেহারা। বারো বছর আগে রাদারফোর্ড পরমাণুর এমন একটা কাঠামোই খাড়া করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসই হচ্ছে পরমাণুর কেন্দ্রবিন্দু। এই কেন্দ্রবিন্দু ধনাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জের অধিকারী। আর তার চারপাশে সবসময়ে ঘুরছে ঋণাত্মক চার্জের ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসে আছে প্রোটন এবং নিউট্রন। আর প্রতিটি পরমাণুতে প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান। ফলে সব মিলিয়ে পরমাণুর

কোনো বৈদ্যুতিক চার্জ নেই। অর্থাৎ পরমাণু বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ। এই হচ্ছে প্রতিটি পরমাণুর গঠন-প্রণালী। এক এক পদার্থের পরমাণুর গঠন এক এক রকম অর্থাৎ প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা ভিন্ন।

ডেনিশ পদার্থবিজ্ঞানী নীল বোর তাঁর বন্ধু রাদারফোর্ডের এই পারমাণবিক কাঠামো সমর্থন করলেন। তিনি এর গাণিতিক ব্যাখ্যা দিয়ে দেখিয়ে দিলেন পরমাণুর কেন্দ্রের চারদিকে ইলেকট্রন কিভাবে ঘুরছে।

রাদারফোর্ডের পরমাণুর গঠন-কাঠামো পরমাণু সম্পর্কে মানুষের নানা জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটালো। আর বিজ্ঞানীদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো পারমাণবিক জগৎ।

পরমাণুর বিভাজন ও আণবিক শক্তি

এদিকে পরমাণুর বুকে তোপ দাগার ব্যাপারে যে সব বিজ্ঞানী সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন, মাদাম কুরীর কন্যা আইরিন কুরী তাঁদের অন্যতম। পিতা-মাতার বিজ্ঞান-সাধনার পূত-পবিত্র পরিবেশে জন্ম আইরিনের। তাই ছেলেবেলা থেকেই আইরিনের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। কালক্রমে মায়ের মতো আইরিনও একজন যশস্বী পদার্থবিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন এবং তিনি বিয়েও করেন ফ্রেডেরিক জোলিও নামে একজন পদার্থবিজ্ঞানীকে।

কর্মজীবনের শুরুতেই আইরিন ও ফ্রেডেরিক কাজ করেন মাদাম কুরীর সহকারী হিসেবে। তারপর তাঁরা দু'জনে একত্রে পরমাণুর বুকে তোপ দেগে সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে মনোনিবেশ করেন। অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর বুকে আলফা কণা দিয়ে আঘাত করে তাঁরা কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন। এই আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলে স্বীকৃত হলো সঙ্গে সঙ্গেই। রাদারফোর্ড ও নীল বোর-এর গবেষণায় পরমাণুর গঠন সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা তৈরি হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা পরমাণু ভাঙ্গার রহস্যও উদ্‌ঘাটন করলেন। আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই. ও. লরেন্স সাইক্লোট্রন নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। এই যন্ত্রটির সাহায্যে নিউট্রন উৎপাদন করে পরমাণু ভাঙ্গার কাজটি আরো সহজ হয়ে উঠলো। গতিশীল নিউট্রনের ছর্‌রা কোনো পদার্থের পরাণুতে আঘাত করতে থাকলে তা ভেঙ্গে অন্য পরামাণুতে রূপান্তরিত হবার সময় প্রভূত পরিমাণে তাপ বিকিরণ করে। আর সেই সঙ্গে উৎপন্ন হয় বিপুল শক্তি। অল্পদিনের মধ্যেই, পরমাণু ভাঙ্গার সময় যে প্রচণ্ড শক্তি বেরিয়ে আসে

তার দিকে দৃষ্টি পড়লো সকলের। আইনস্টাইন হিসাব করে বললেন, পদার্থ শক্তির সমান অর্থাৎ পদার্থের সাঠিক রূপান্তর সম্ভব হলে তা থেকে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ হবে সম-পরিমাণ কয়লা পুড়িয়ে উৎপন্ন শক্তির দুই কোটি গুণের চেয়েও বেশি। এই শক্তিই পারমাণবিক শক্তি।

পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে এবার শুরু হলো নানারকম গবেষণা। আবিষ্কৃত হলো পরমাণু ভাঙ্গার নতুন নতুন কৌশল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৮ সাল থেকেই পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো সকলের। বিখ্যাত ইতালিয় পদার্থবিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি পরমাণুর কেন্দ্রীন ভেঙ্গে পদার্থের পরিবর্তন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন যে, নিউট্রন দিয়ে পরমাণুকে আঘাত করে তিনি তার চেয়েও ভারি পরমাণু সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান ও স্ট্রাসমান বললেন, ফার্মির ধারণা ঠিক নয়।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর মাত্র কয়েক মাস আগে জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান এবং তাঁর সহকর্মী বিজ্ঞানী লিজে মাইটনার গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন যে, সাইক্লোট্রন থেকে পাওয়া দ্রুতগতি নিউট্রন দিয়ে সবচেয়ে ভারি অথচ শিথিল-বন্ধন ইউরেনিয়াম ধাতুর পরমাণু-কেন্দ্রীনকে আঘাত করলে (১) পরমাণু দু'টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যায় এবং (২) এভাবে ভাঙ্গার সময় তা থেকে প্রভূত শক্তি ছাড়া পায়। একেই বলা হ'লো পারমাণবিক বিভাজন বা নিউক্লিয়ার ফিশন। বিজ্ঞানী বেথে গাণিতিকভাবে হিসাব কষে দেখালেন, ইউরেনিয়াম পরমাণুর খণ্ড দু'টি ১৮ কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসে। অটো হান ইউরেনিয়াম পরমাণু ভেঙ্গে যে দু'টি পরমাণু পেয়েছিলেন সেগুলির একটি ছিল বেরিয়াম, এবং অপরটি ছিল ক্রিপটন।

এখানে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে আর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। আমরা জানি, পরমাণুর কেন্দ্রীনে আছে প্রোটন ও নিউট্রন এবং অই কেন্দ্রীনের চারদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরছে ইলেকট্রন। একটি পরমাণুর কেন্দ্রীনে যতগুলি প্রোটন থাকবে, বাইরের কক্ষপথেও থাকবে ততগুলি ইলেকট্রন। কোনো পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রীনের প্রোটন-সংখ্যাকে পদার্থটির 'অ্যাটমিক নাম্বার' বা 'পরমাণু-সংখ্যা' বলা হয়। আবার প্রোটন ও নিউট্রনের ওজন প্রায় সমান হওয়ায়, প্রোটন ও নিউট্রনের সমষ্টিকে বলে পদার্থের পারমাণবিক ওজন বা অ্যাটমিক

ওয়েট'। অতএব কোনো পদার্থের পারমাণবিক ওজন থেকে পরমাণু সংখ্যা বিয়োগ করলেই তাতে নিউট্রনের সংখ্যা পাওয়া যাবে।

এবার বিশ শতকের বিজ্ঞানীদের কাছে পরমাণুর চেহারা জানাই শুধু একমাত্র কাম্য রইলো না। তাঁরা দেখলেন, পরমাণু ভাঙ্গার সময় যে এনার্জী বা শক্তি পাওয়া যায় তা যদি মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব হয় তাহলে বিজ্ঞানের ইতিহাসে শুরু হবে নতুন একটি যুগ। এই চিন্তা ছিল মানুষের সেই আণবিক শক্তির চিন্তা। বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর 'ম্যাস-এনার্জী সমীকরণে' বস্তুর অভ্যন্তরের এই অপরিমিত শক্তির কথাই উল্লেখ করেছেন। সে শক্তি আহরণের সাধ্য মানুষের করায়ত্ত হলো পরমাণু ভাঙ্গা বা পরমাণু বিভাজনের মাধ্যমে। বিজ্ঞানীরা একেই বলেন 'নিউক্লিয়ার ফিশন বা পারমাণবিক বিভাজন।

আলবার্ট আইনস্টাইন

সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন। আইনস্টাইনের জন্ম জার্মানীর উলম শহরে, ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ। ছেলেবেলায় আইনস্টাইন লেখাপড়া করেন জার্মানীর মিউনিখ শহরে। তাঁর বয়স যখন ষোল বছর তখন তাঁর পিতা মিলানে গিয়ে বসবাস



করতে থাকেন। মিলানে কয়েকমাস থাকার পর আইনস্টাইন জুরিখের পলিটেকনিক স্কুলে ভর্তি হন। এখানে ক্লাশের বাঁধাধরা লেখাপড়ায় আইনস্টাইন কিন্তু তেমন কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারলেন না। শুধু

গণিতেই ছিল তাঁর অসাধারণ মেধা। তবে এখানে থাকার সময়ই আইনস্টাইন তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় গভীরভাবে পড়াশোনা করেন অত্যন্ত আগ্রহের সাথে। তিনি পড়তে থাকেন ইউক্লিড, নিউটন, স্পিনোজা, দেকার্তে প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীর রচনা। জুরিখের পলিটেকনিক একাডেমী থেকে খুব সাধারণভাবে পাশ করে বেরুনোর পর আইনস্টাইন চাকরি পেলেন বার্ন-এর পেটেন্ট অফিসে, কেরানীর চাকরি। এই পেটেন্ট অফিসে বসে বসেই অবসর সময়ে সকলের আগোচরে আইনস্টাইন ব্যাপৃত থাকতেন গণিতের কঠিন সব সমাধান নিয়ে, কাউকে আসতে দেখলেই তাড়াতাড়ি তাঁর সব কাগজপত্র লুকিয়ে ফেলতেন ড্রয়ারে। তারপর একদিন তিনি একটি বড় খামে ভরে তাঁর কিছু কাগজপত্র পাঠালেন একটি বিজ্ঞান পত্রিকার নামে। প্রকাশিত হলো তাঁর 'স্পেশাল থিওরী অব রিলেটিভিটি'। এই লেখাটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানীমহলে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন আইনস্টাইন। সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর খ্যাতি। এরপর ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত আইনস্টাইন কাজ করলেন কোয়ান্টাম তত্ত্ব নিয়ে। ১৯০৯ সালে আইনস্টাইন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। এরপর ১৯১৩ সালে তিনি বার্লিনের 'কায়জার ভিলহেল্ম ফিজিক্যাল ইনস্টিট্যুট-'এর পরিচালক নিযুক্ত হন। একই সময়ে তিনি নির্বাচিত হলেন প্রুশিয়ার একাডেমী অব সায়েন্সেস-এর সদস্য। আর ১৯২৫ সালে আইনস্টাইন ব্রিটিশ রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হলেন। এদিকে ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয় আইনস্টাইনের 'জেনারেল থিওরী অব রিলেটিভিটি'।

আইনস্টাইনের আগে নিউটনই প্রথম যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সুসংবদ্ধ করে বিশ্ব-প্রকৃতির এক পরিপূর্ণ চিত্র গড়ে তোলেন। নিউটনের গতিবিদ্যা বিষয়ক সূত্রাবলী এবং মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব ছিল বিশ্ব-প্রকৃতির পরিচয় সম্পর্কে প্রথম গাণিতিক উপস্থাপনা। ইউরোপীয় রেনেসাঁর পূর্ব পর্যন্ত গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল যেমন বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার জগতটিকে অনেকখানি অধিকার করে রেখেছিলেন, তেমনি আইনস্টাইনের পূর্ব পর্যন্ত নিউটনই ছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান ব্যক্তিত্ব। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিকে পরমাণু-জগত উদ্ঘাটনের সাথে সাথে দেখা দিলো নতুন সমস্যা। নিউটনের চিন্তাধারা ও নিয়মাবলী এসব সমস্যার যথার্থ সমাধান প্রদানে ব্যর্থ হলো। আইনস্টাইনের তত্ত্ব সফল হলো এই ব্যর্থতার প্রতিকার করতে। আইনস্টাইন নিউটনের বিশ্ব-প্রকৃতির ধারণাটিকেই সম্পূর্ণ

বদলে দিলেন। আইনস্টাইনের প্রথম কথা হলো—নিউটন গোড়াতেই স্থান, কাল, বস্তুমান ও গতি—এগুলোর একটা পরম মানদণ্ড ধরে নিয়েছেন। কিন্তু সত্যি সত্যি সেই পরম মানদণ্ড বলে কিছু কি আছে? এর উত্তরটিও দিলেন আইনস্টাইন নিজেই।

ধরা যাক, পরম গতির কথাই। কেউ যদি বলে, গাড়িটি ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে ছুটছে, আর তাকে যদি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয় ঘণ্টায় ৪০ মাইল কার সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে—তা'হলে সে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্নটি মোটেই অর্থহীন নয়। রাস্তার ধারে যদি কোনো লোক দাঁড়িয়ে থাকে তা'হলে তার সাথে তুলনায় গাড়িটির বেগ অবশ্যই ঘণ্টায় ৪০ মাইল। কিন্তু অন্য কোনো লোক যদি আরেকটি গাড়িতে চড়ে একই বেগে উল্টো দিকে যেতে থাকে, তা'হলে তার সাথে তুলনায় মনে হবে আগের গাড়িটি ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটে যাচ্ছে। আবার প্রথম গাড়িটির মধ্যে যে লোকটি বসে আছে তার তুলনায় অই গাড়িটির বেগ অবশ্যই শূন্য। অতএব দেখা যাচ্ছে, কোনো জিনিসের ধারণাটি নির্ভর করে দর্শকের নিজের অবস্থার ওপর।

আইনস্টাইনের মতে আলোর গতি ব্যতীত অপর সব গতিই আপেক্ষিক। শুধু তাই-নয়, আলোর গতিই হল চূড়ান্ত গতি—এর চেয়ে বেশি কোনো জিনিসের গতি হতে পারে না।

নিউটন ধরে নিয়েছিলেন পরস্পর আপেক্ষিক গতিশীল দু'টো কাঠামোর মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফলে কোনো তারতম্য ঘটবে না। অর্থাৎ কাঠামোটি স্থির কিংবা গতিশীল, যাই হোক না কেন, তাতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বস্তুমান, সময়ের হিসাব অপরিবর্তিত থাকবে। কিন্তু আইনস্টাইন বললেন, গতি বাড়লে স্থির কাঠামোর তুলনায় বস্তুমান বাড়বে, দৈর্ঘ্য কমবে, সময়ের হিসাব কমবে। আলোর গতিবেগের অর্ধেক গতিবেগ পর্যন্ত এই পরিবর্তন হবে খুবই ধীরে ধীরে; আলোর গতিবেগের যত কাছাকাছি পৌঁছানো যাবে, এই পরিবর্তনও ঘটবে তত দ্রুত। তারপর চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছতে পৌঁছতে বস্তুমান হয়ে উঠবে অনন্ত, দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে শূন্যের কোঠায় আর তাতে সময় যাবে থেমে। আধুনিক বিজ্ঞানে আলোর গতিবেগের কাছাকাছি গতিবেগ বিশিষ্ট আনবিক কণিকা নিয়ে অনবরতই পরীক্ষা চলছে আর সেখানে মিলেছে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্তের নির্ভুল সমর্থন। আর এই সব পরীক্ষা চিরদিনের মতো ধূলিসাৎ করে দিয়েছে পুরনো দিনের পরম স্থান-কাল-গতি এবং বস্তুমানের ধারণাকে।

উনিশ শতক পর্যন্ত বিজ্ঞান বস্তু এবং শক্তিকে একেবারেই পৃথক দু'টি সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে। গতিবেগ বাড়লে, দেখা যাচ্ছে, বস্তুমান বাড়ে। আবার গতিবেগ বাড়লে গতিশক্তিও বেড়ে যায়—এ তো জানা কথাই। তাহলে বস্তুমান আর শক্তির মধ্যে সম্বন্ধটা কি? আইনস্টাইন গাণিতিক সূত্র দিয়ে প্রমাণ করলেন, আসলে শক্তি আর বস্তুমান একই জিনিসের দু'টি ভিন্ন রূপ—একটিকে অন্যতে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

তিনি বললেন, আমরা পদার্থের যে শক্তিকে কাজে ব্যবহার করেছি তা পদার্থের সম্পূর্ণ শক্তির সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। আইনস্টাইনের মতে, বস্তুমান ও শক্তির গাণিতিক সমীকরণ হচ্ছে : $E=mc^2$। এখানে $E=$এনার্জী বা শক্তি, $m=$ম্যাস বা ভর অর্থাৎ বস্তুমান এবং $c=$ আলোর গতিবেগ। পরমাণু বিভাজনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অপরিমেয় শক্তি থেকে প্রমাণিত হলো যে, আইনস্টাইনের এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ নির্ভুল।

অন্যদিকে আইনস্টাইন স্থান-কাল সম্পর্কে নিউটনের পরম প্রকৃতির ধারণাই শুধু ভেঙে দেননি, বরং আপেক্ষিক-তত্ত্ব ভিত্তিক নতুন ধারণার সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতির নতুন এক রূপ গড়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন, স্থান ও কালের প্রভেদ সম্পর্কে ধারণা আসলে আমাদের মনের তৈরি। কিন্তু যে-সব বস্তুপুঞ্জ বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনার আসল নায়ক তারা মানুষের মনের সে-সব ধারণার কথা কিছুই জানেনা, তারা নিতান্ত প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে চলে মাত্র। স্থানের ব্যবধান এবং কালের ব্যবধানকে আমরা যে রকম আলাদা করে দেখি, আসলে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা সে ভাবে আলাদা করে দেখা কৃত্রিম, বাস্তবসম্মত পদ্ধতি হলো, স্থান-কালের ব্যবধানকে এক সঙ্গে করে দেখা। কালকে এভাবে স্থানের তিন মাত্রার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় আমাদের জগৎ হয়ে দাঁড়ালো চার মাত্রার অর্থাৎ চতুর্মাত্রিক জগৎ।

ইউক্লিডের জ্যামিতির সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে আইনস্টাইন বলেছেন, স্থান-কালের চার মাত্রার রূপ এমন যে তাতে বস্তুর উপস্থিতি ঘটলেই সেখানে আর ইউক্লিডের জ্যামিতি দিয়ে কাজ চলে না, স্থান (স্পেস) যায় বেঁকে, সবচেয়ে সহজ পথ হয়ে দাঁড়ায় বাঁকা রেখা। অতএব কোনো ভারি বস্তুমানের অস্তিত্বের জন্যই যখন স্থান-কাল-জগতের পথ বেঁকে যায়, তখন তার কাছ দিয়ে আলোকরশ্মি যাবার সময় তার পথও বেঁকে যাবে। ১৯১৯ সালে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের ধার ঘেঁষে আসা তারার অলো পরীক্ষা করে এই বাঁকবার কথা জানা গেল। পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ মিললো আইনস্টাইনের বক্তব্যের।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পদার্থবিজ্ঞানে যে দু'টি নতুন ঘটনা বিজ্ঞান-জগতে বৈপ্লবিক উত্তরণ সৃষ্টি করে—তার একটি কোয়ান্টাম তত্ত্বের আবিষ্কার এবং অপরটি আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক-তত্ত্ব। ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের ব্যাখ্যার জন্য সর্বব্যাপী ইথার-মাধ্যম কল্পিত হলেও, মাইকেলসন ও মর্লি পৃথিবীর গতি নির্ধারণের যে পরীক্ষা করেন, তাতে ইথার-মাধ্যমের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলো না। অপরদিকে সনাতন বলবিদ্যার আলোকে সংগঠিত ম্যাকসওয়েল বোল্‌ৎমান সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব প্রতীয়মান হলো।

এই দ্বিতীয় বাধাটি অতিক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন ম্যাক্স প্ল্যাংক, ১৯০০ সালে। ম্যাক্স প্ল্যাংকের জন্ম জার্মানীতে। শিক্ষা-জীবনে কোন্ বিষয়টি তিনি বেছে নেবেন, এ নিয়ে মনে তাঁর অনেক দ্বন্দ্ব ছিল। ভাষাতত্ত্ব, সঙ্গীত এবং পদার্থবিদ্যা—এই তিনটি বিষয়েই ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো অবশ্য পদার্থবিদ্যা। তবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সঙ্গীতচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। প্ল্যাংক ছিলেন একজন সুদক্ষ পিয়ানো-বাদক।

সনাতন পদার্থবিজ্ঞানে ধারণা করা হয় যে, তাপ, দৃশ্য-আলোক, অতিবেগনি আলোক, রঞ্জন-রশ্মি, গ্যামা-রশ্মি ইত্যাদি সবই তরঙ্গে প্রবাহিত হয় এবং এই তরঙ্গ ইথার-তরঙ্গ বা তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ যাই হোক না কেন, এর একটা অবিচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতা আছে। উজ্জ্বলভাবে দীপ্ত পদার্থ থেকে যে সব বিকিরণ ঘটে সে সম্পর্কে অনু-সন্ধান করতে গিয়ে ম্যাক্স প্ল্যাংক দেখলেন যে, অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ-প্রবাহের ধারণা দ্বারা অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা প্রাদান করা যায় না। প্ল্যাংক বললেন, বিকিরণের মাধ্যমে যে শক্তি বা এনার্জি বেরিয়ে যায় তা অবিচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিকভাবে নয়, বরং বিচ্ছিন্নভাবে গুচ্ছে গুচ্ছে বেরোয়। অর্থাৎ তেজশক্তি মূলত এক-একটি বাণ্ডিলে বেরিয়ে আসে। এবং সবচেয়ে নতুন কথা হচ্ছে, এক্ষেত্রে শক্তির একক সর্বত্র অভিন্ন নয়। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে প্ল্যাংক বললেন, কম্পন-সংখ্যা যেখানে কম, প্যাকেট সেখানে ছোট, আবার কম্পান-সংখ্যা যেখানে বেশি প্যাকেট সেখানে বড়। প্ল্যাংকের এই তত্ত্বেরই নাম হচ্ছে 'কোয়ান্টাম থিয়োরি' বা 'কোয়ান্টাম তত্ত্ব'।

আইনস্টাইন প্ল্যাংকের তত্ত্ব গ্রহণ করে বললেন যে, শুধু রশ্মি নির্গমনের ক্ষেত্রে নয়, বরং রশ্মি যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিচালিত হয়,

তখনও তা বিচ্ছিন্নভাবে 'কোয়ান্টাম' বা 'প্যাকেট' হিসেবে গমন করে। এতএব প্ল্যাংকের কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে আলোক বা শক্তিও হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম কণিকা-প্রবাহ। এই কণিকাকে বলা হয় ফোটন।

দ্য-ব্রগলি তরঙ্গ

প্ল্যাংকের কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং আইনস্টাইনের 'ফোটন' তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পর, সপ্তদশ শতকে নিউটন ও টমাস ইয়ুং-এর মধ্যেকার আলোকের কণিকা ও তরঙ্গ-তত্ত্বের দ্বন্দ্বটি আবায় উপস্থাপিত হলো বিজ্ঞানীদের চিন্তারাজ্যে। শক্তি বা আলোকের যদি তরঙ্গ-প্রকৃতি ও কণিকা-প্রকৃতি দ্বৈতভাবে থাকতে পারে, তাহলে ইলেকট্রনেরও কি দু'টি প্রকৃতি থাকতে পারে না? ফরাসী বিজ্ঞানী লুই দ্য-ব্রগলি বললেন, জড় কণিকাও তরঙ্গাকার ধারণ করতে পারে। ১৯২৪ সালে তিনি প্রস্তাব করলেন যে, অণু, পরমাণু, প্রোটন, ইলেকট্রন প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন কণিকা দ্বারা গঠিত পদার্থও নিশ্চয়ই কোনো উপযুক্ত পরিবেশে তরঙ্গ-প্রকৃতি প্রদর্শন করবে। অর্থাৎ পদার্থেরও ঠিক আলোকের মতো দ্বৈত-প্রকৃতি রয়েছে। প্রত্যেকটি চলমান পদার্থ-কণিকার সাথে জড়িত রয়েছে তরঙ্গ। এরই নাম হলো দ্য-ব্রগলি তরঙ্গ।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা

কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং দ্য-ব্রগলির তরঙ্গ-তত্ত্বের পর প্রয়োজন পড়লো নতুন গাণিতিক ভাষার। বলা বাহুল্য, নিউটন প্রবর্তিত সনাতন বলবিদ্যা আর সমর্থ হচ্ছিলো না জড় ও শক্তির অভিন্ন চরিত্রের গাণিতিক উপস্থাপনা ব্যাখ্যা করতে। এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন জার্মান বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ। মেট্রিক্স বীজগণিতের সাহায্যে হাইসেনবার্গ সর্বপ্রথম কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রবর্তন করলেন। এদিকে বিজ্ঞানী শ্রোয়েডিঙ্গার তাঁর পরমাণু-তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য 'তরঙ্গ বলবিদ্যা'র উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি দেখালেন যে, হাইসেনবার্গের কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এবং তাঁর আবিষ্কৃত তরঙ্গ-বলবিদ্যা গণিতিকভাবে সমতুল্য।

হাইসেনবার্গের অনির্দেশ্যতাবাদ

বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানে আর একটি যুগান্তকারী তত্ত্ব হচ্ছে হাইসেনবার্গের অনির্দেশ্যতাবাদ। আমরা জানি, পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ

বিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য দিক। পরিমাপ যেমন প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট গাণিতিক কাঠামো নির্মাণে সহায়তা করে, পর্যবেক্ষণও তেমনই প্রকৃতির বিন্যাস ও নিয়ম সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে সুসংহত করে। পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি আমরা ব্যবহার করি এবং বাইরের জগতের একটি নির্দিষ্ট রূপ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করি। আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি সীমিত। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই সীমা অনেকখানি বাড়ানো সম্ভব। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ যন্ত্র। এদিকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আবিষ্কারের পর অণুজাগতিক ঘটনাবলীর সুনির্দিষ্ট কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে গাণিতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে হাইসেনবার্গ প্রথম উল্লেখ করেন যে, আমরা যত সূক্ষ্ম যন্ত্রই ব্যবহার করি না কেন, তবু ভুলের একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা মানুষের সম্পূর্ণ অসাধ্য। এটিই হাইসেনবার্গের অনির্দেশ্যতা তত্ত্ব।

পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে বিজ্ঞানীদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, পরমাণুর গঠন এবং অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-পদ্ধতি জানা গেলে সৃষ্টি-রহস্য অথবা সৃজন-কাঠামো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন সম্ভব হবে। হাইসেনবার্গের অনির্দেশ্যতা তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের এই ধারণার পথে প্রথম প্রত্যাঘাত। বস্তুত পরমাণু-জগতের গোলক-ধাঁধার মধ্যে যতই এগিয়ে যাওয়া হয়েছে, ততই সৃজন-কাঠামোর জটিলতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে—একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতাই বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানকে তীব্রতর করেছে, বিজ্ঞান সাধনার একাগ্রতায় এনে দিয়েছে অদম্য প্রেরণা।

উপমহাদেশে নববিজ্ঞান

আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা ও চর্চা প্রধানত ইউরোপেই ছিল সীমাবদ্ধ। উনিশ শতকে আমেরিকায়ও বিজ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটে। বস্তুত আধুনিক বিজ্ঞানচর্চায় ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদিত পণ্যের বাজার অন্বেষণ এবং সুলভে কাঁচামাল সংগ্রহের প্রয়োজনে ইউরোপীয়রা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করে।

আমাদের এই উপমহাদেশ তথা বর্তমান বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান অঞ্চলেও অষ্টাদশ শতকে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তৃত হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এদেশে সূচিত হয় দু'শো বছরের ইংরেজ

শাসন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে লর্ড ওয়েলেসলি ভারতের গভর্নর জেনারেল থাকাকালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। কলেজটি স্থাপিত হয় প্রধানত কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের এদেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে এই কলেজটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পক্ষান্তরে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর উদ্যোগে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং কলকাতায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। অতঃপর লর্ড ডালহৌসী এদেশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেন এবং ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

ইংরেজ শাসনামলে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে এদেশে আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটে। আধুনিক বিজ্ঞানচর্চায় উপমহাদেশের যেসব বিজ্ঞানী তাঁদের আবিষ্কার ও বিজ্ঞান-সাধনার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রফেসর আবদুস সালাম প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আচার্য জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্রের জন্ম ১৮৫৯ সালে, ময়মনসিংহে। আদিনিবাস ঢাকা জেলার রাড়িখালে। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। পিতার কর্মক্ষেত্র ফরিদপুরে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। পরে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ও কলেজে শিক্ষা লাভ করে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে গ্র্যাজুয়েট হন। তাঁর ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়ার জন্য ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। কেমব্রিজ থেকে বিজ্ঞানে অনার্সসহ বি. এ. এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস-সি. পাশ করেন। দেশে ফিরে ১৮৮৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। এ সময় কলেজে বৈদ্যুতিক চুম্বক-তরঙ্গ নিয়ে কিছু কাজ করেন। তাঁর নিজের তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে অতিক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, এ ধরনের তরঙ্গেও দৃশ্য-আলোর সকল ধর্ম বর্তমান। এই সময়ে তিনি বিনাতারে বার্তা প্রেরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৯৬ সালে তিনি ডি. এস-সি. উপাধি লাভ করেন। ১৯০০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা কংগ্রেসে পঠিত তাঁর

প্রবন্ধ 'জড় ও জীবের মধ্যে উত্তেজনা-প্রসূত বৈদ্যুতিক সাড়ার ক্ষমতা' বিজ্ঞানী সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। মানুষের স্মৃতিশক্তির যান্ত্রিক মডেল তিনিই প্রথম প্রস্তুত করেন। আধুনিক ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ইত্যাদির সৃষ্টি অংশত তাঁর এই মৌলিক চিন্তার অনুসরণেই সম্ভব হয়েছে। এরপর তিনি বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় উদ্ভিদের সাড়া বিষয়ে গবেষণা করেন এবং এসব গবেষণার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফ, স্ফিগমোগ্রাফ, পোটোমিটার ও ফোটোসিন্থেটিকবাব্‌লার প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কার করে।

জগদীশচন্দ্র বসু ১৯১৫ সালে অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করে সেখানে গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯২০ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য, ১৯২৭ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি এবং ১৯২৮ সালে ভিয়েনার 'একাডেমী অফ সায়েন্সে'র বৈদেশিক সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর রচিত 'অব্যক্ত' গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ১৯৩৭ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বর্তমান বাগেরহাট জেলার রাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৬১ সালে। কলকাতা অ্যালবার্ট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে তিনি প্রথমে মেট্রোপলিটন ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে লেখাপড়া করেন। অতঃপর ১৮৮২ সালে তিনি বিলাত যান এবং সেখানে বি. এস-সি. পাশ করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৮৮ সালে দেশে ফিরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়ন-বিদ্যায় অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রসায়নচর্চা ও রসায়ন বিষয়ে মৌলিক গবেষণার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। ১৯০১ সালে উপমহাদেশে তিনিই প্রথম রাসায়নিক কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রেরণা ও অর্থ-সাহায্যে 'ইণ্ডিয়ান কেমি-ক্যাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা প্রবর্তনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা। প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তিনি তাঁর ছাত্রদের বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। প্রধানত তাঁর চেষ্টাতেই এখানে রসায়নচর্চা ও গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৯৪৪ সালে পরলোক গমন করেন।

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন

উপমহাদেশে পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন। তাঁর জন্ম ১৮৮৮ সালে, ভারতের মাদ্রাজে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করার পর তিনি কয়েক বছর সরকারি চাকরি করেন। এরপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। অধ্যাপনার সাথে সাথে তিনি আলোক-বিজ্ঞান ও শব্দ-বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা চালিয়ে যান এবং আলোক-বিচ্ছুরণ বিষয়ে 'রমন এফেক্ট' নামে একটি মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, ১৯২৮ সালে। তাঁর এই মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৩০ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর কিছুকাল তিনি ব্যাংগালোর ইনস্টিটিউটে গবেষণা করেন। অতঃপর বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি মাদ্রাজে 'রমন ইনস্টিটিউট' নামে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং জীবনের শেষ দিনগুলো সেখানেই গবেষণায় অতিবাহিত করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে যে বাঙালী বিজ্ঞানী জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁর নাম সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী উত্তর কলকাতার গোয়াবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৯ সালে প্রবেশিকা, ১৯১১ সালে আই. এস-সি. ও ১৯১৩ সালে গণিতে অনার্সসহ বি. এস-সি. পাশ করার পর তিনি ১৯১৫ সালে মিশ্রগণিতে এম. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। বলা বাহুল্য, লেখাপড়ায় তিনি বরাবরই ছিলেন অসাধারণ মেধাবী।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুনোর পরপরই সত্যেন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে নব-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং এই কলেজকে গবেষণামুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখেন। অতঃপর ১৯২১ সালে তিনি সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন। এখানেই সত্যেন্দ্রনাথ অতি-বাহিত করেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে

অধ্যাপনা কালেই ১৯২৪ সালে জার্মানীর এক গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম মৌলিক গবেষণামূলক রচনা, 'প্ল্যাঙ্ক সূত্র ও কোয়ান্টাম অনুকল্প'। 'ৎসাইট ফ্যুর ফিজিক' পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটির জার্মান অনুবাদক ছিলেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন।

এর কিছুকাল পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহায্যে দু'বছরের জন্য তিনি ইউরোপ যান। এ সময় ইউরোপ ভ্রমণকালে তিনি জার্মানীতে আইনস্টাইনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং প্যারিসে মাদাম কুরীর গবেষণাগারে কিছুকাল কাজ করার সুযোগ লাভ করেন। প্রায় পঁচিশ বছর অধ্যাপনা করার পর সত্যেন্দ্রনাথ ১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এবার তিনি আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খয়রা অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করলেন। ১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৫৮ সালে পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদানের জন্য তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের বিশাল এক ক্ষেত্র জুড়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদান পরিব্যাপ্ত। মৌলিক পদার্থ-কণার স্পিন সম্পর্কিত তত্ত্বীয় গবেষণায় 'বোস-আইনস্টাইন' সংখ্যায়ন একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত। শূন্য বা এক স্পিনসম্পন্ন কণাগুলিকে তাই 'বোসন' নামে অভিহিত করা হয়। এছাড়াও 'বিকিরণ ক্ষেত্র', 'একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব' এবং 'রেডিও-তরঙ্গের প্রতিফলন-প্রতিসরণ' ইত্যাদি বিষয়েও তিনি মৌলিক গবেষণা করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানী। ১৯৭৪ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞান-সাধনায় ছিলেন আত্মনিমগ্ন।

মেঘনাদ সাহা

মেঘনাদ সাহা ১৮৯৩ সালে ঢাকা জেলার সেওড়াতলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র পিতার সন্তান। তাই অনেক কষ্ট করেই তাঁকে লেখাপড়া করতে হয়। ১৯০৯ সালে তিনি ঢাকার জুবিলী স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করেন। এরপর ঢাকা কলেজ থেকে আই. এস-সি. পাশ করেন এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে গণিতে অনার্সসহ বি. এস-সি. ও ১৯১৫ সালে ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণীতে এম. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১৮ সালে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনার কাজ পান। এখানে গবেষণা করে পর পর দু'বছরে তিনি ডি. এস-সি. ও পি. আর. এস. হন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল

আপেক্ষিক-তত্ত্ব, আলোর চাপ এবং নভোপদার্থবিদ্যা। এরপর ১৯২০ সালে 'থিওরি অফ থার্মাল আয়নাইজেশন' বিষয়ে গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' বর্তমানে 'সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' নামে পরিচিত এক বিখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ডঃ মেঘনাদ সাহা ১৯৫৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

কুদরত-এ-খুদা

বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ ডঃ কুদরত-এ-খুদা। ডঃ খুদার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তিনি এদেশে সংগঠিত বিজ্ঞান-চর্চার প্রধান সংগঠক এবং বিজ্ঞানান্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর জন্ম ১৯০০ সালের ১লা ডিসেম্বর। ডঃ মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদার পৈত্রিক নিবাস ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার মারগ্রামে। ছাত্র হিসেবে কুদরাত-এ-খুদা বেশ মেধাবী ছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি কলকাতার উডবার্ন এম. ই. স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং ১৯২৪ সালে রসায়নশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। এর পরপরই তিনি উচ্চশিক্ষার জন্যে লণ্ডন যান। সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ সালে তিনি ডি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। একই সময়ে তিনি ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি থেকে ডি. আই. সি. ডিগ্রী লাভ করেন।

চাকরিসূত্রে সারাজীবন বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে এদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং প্রয়োগমুখী গবেষণার মাধ্যমে দেশীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অসামান্য। প্রকৃতপক্ষে ডঃ কুদরত-ই-খুদাই প্রথম বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চতর পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তাঁর এই প্রয়াসের ফলেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষা ব্যবহার সম্পর্কে অমূলক সন্দেহ দূরীভূত হয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংগঠনের ক্ষেত্রে ডাঃ কুদরত-এ-খুদার অবদান 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ'। দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠান সংগঠনে তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এই

প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃতির সম্পদ সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তৃতীয় বিশ্বের প্রায়োগিক বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব আজ সমধিক। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত বৈজ্ঞানিক গবেষণাও মূলত দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীভূত। ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা ১৯৭৭ সালে ৭৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

প্রফেসর আবদুস সালাম

উপমহাদেশের পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রফেসর আবদুস সালামই দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য শেল্ডন গ্ল্যাশো ও স্টিভেন ওয়েনবার্গ-এর সঙ্গে একসাথে ১৯৭৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান প্রফেসর আবদুস সালাম। পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাবের লাহোর থেকে ২০০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে জং-এ তাঁর জন্ম, ১৯২৭ সালে। শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর ১৯৪৬ সালে উচ্চশিক্ষার্থে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি গণিত ও পদার্থবিদ্যার ট্রাইপস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেয়ে র‍্যাংলার হন। অতঃপর কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডিনামিক্স বিষয়ে গবেষণা-কর্মের জন্য লাভ করেন পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী।

১৯৫১ সালে দেশে ফিরে এসে ডঃ সালাম লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নেন এবং ১৯৫৪ সালে পর্যন্ত লাহোরেই থাকেন। কিন্তু সেখানে তাঁর গবেষণার সুযোগ না পেয়ে আবার কেমব্রিজেই ফিরে যান এবং ১৯৫৭ সালে ইম্পিরিয়াল কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এরপর তিনি উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিজ্ঞানীদের গবেষণার সুযোগ প্রদানের জন্য ইতালীর ত্রিয়েস্তে স্থাপিত আন্তর্জাতিক তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক পদে যোগদান করেন। ১৯৬৪ সালে এই ইনস্টিটিউট স্থাপিত হওয়ার পর থেকে তিনি এর পরিচালক হিসেবে কাজ করে আসছেন। বর্তমানে তিনি লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি'র তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক।

এ যুগের বিজ্ঞান

ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানচর্চায় যে স্বুবর্ণ যুগ শুরু হয়েছিল তার একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। বিশ শতকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তির বিকাশে শুরু হলো এক ব্যাপকতর প্রয়াস। পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় এগিয়ে এলেন নানা দেশের অসংখ্য বিজ্ঞানী। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব, হাইজেনবার্গ-এর অনির্দেশ্যতাবাদ, কেলাসিত কঠিন পদার্থ সম্পর্কিত গবেষণা এবং ইলেকট্রনিক-প্রযুক্তির মাধ্যমে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান উন্নীত হলো বিকাশের এক অভূতপূর্ব স্তরে। অন্যদিকে ডি. এন. এ. গঠন, জেনেটিক প্রকৌশল, ভাইরাসের গঠন, হরমোন গবেষণা ইত্যাদির ব্যাপক চর্চার ফলে জীববিদ্যার ক্ষেত্রেও ঘটলো অনন্য অগ্রগতি।

প্রধানত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপরই মহাকাশবিজ্ঞান সহ নির্মাণ ও প্রকৌশল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের নিরলস সাধনার মাধ্যমে প্রায়োগিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় ঘটতে লাগলো নতুন নতুন আবিষ্কার। নভো-পদার্থবিজ্ঞানের চর্চায় এ-সময়ে যে অগ্রগতি সাধিত হলো, তার ফলে মহাবিশ্বের গঠন এবং মৌলকণা বিষয়ে নতুন চিন্তা-ভাবনার সূত্রপাত ঘটলো। রসায়ন ও চিকিৎসাবিজ্ঞান সরাসরি আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে সংযুক্ত হলো। বস্তুত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানচর্চা যেন বিজ্ঞানে এক বিরাট কর্মশালা, যেন নতুন নতুন উদ্ভাবন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণার মধ্যে নিয়ে এলো অভাবিতপূর্ব সব চিন্তাভাবনা। এ যুগের বিজ্ঞান তাই সম্পূর্ণ নতুন এক বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত এবং সৃষ্টি ও উদ্ভাবনার প্রাচুর্যে উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ। এই বিচিত্র ও বিশাল বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এ বইয়ে তেমন কোনো আলোচনার সূত্রপাত করা হয়নি। কেননা এ যুগের বিজ্ঞানচর্চা নিয়ে একাধিক পৃথক গ্রন্থ রচিত না হলে এ সম্পর্কে যথার্থ পরিচয় তুলে ধরা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. The Major Achievements of Science (Volume I) : A.E.E. Mckenzie.
2. Great Pioneers of Science : Walter Shepherd.
3. Living Biographies of Great Scientists : Henry Thomas and Dana Lee Thomas.
4. A History of the Sciences : Stepen F. Mason.
5. The Growth of Scientific Ideas : W. P. D. Wightman.

৬. চার্লস ডারুইন : পিতামহ, সুহৃদ, সহযাত্রী : দ্বিজেন শর্মা

৭. বিজ্ঞান বিচিত্রা : উইলিয়াম এইচ. ক্রাউস. (অনুবাদ : রূপম চৌধুরী)

৮. অন্ধকার থেকে আলোয় : রিচার্ড ডব্লিউ বিশপ (অনুবাদ : বেগম সালেমা খাতুন)

৯. পারমাণবিক শক্তির অভিযান : লরা ফার্মি (অনুবাদ : সিরাজুদ্দীন হোসেন)

১০. প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) : জর্জ সার্টন (অনুবাদ : মহীউদ্দীন)

১১. আবিষ্কারের নেশায় : আবদুল্লাহ আল-মুতী

১২. আবিষ্কারের অভিযান : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৩. মানুষের ঠিকানা : অমল দাসগুপ্ত

১৪. মানুষের জন্য বিজ্ঞান : তপন চক্রবর্তী

১৫. বিজ্ঞান ভারতী : শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস

১৬. বিজ্ঞান সাময়িকী : চতুর্দশ বর্ষ। চতুর্থ সংখ্যা

১৭. বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা : পঞ্চম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা

১৮. বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা : ষষ্ঠ বর্ষ। চতুর্থ সংখ্যা

১৯. বিজ্ঞানের ইতিহাস ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : ধীমান দাশগুপ্ত

২০. ব্যাধির পরাজয় : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
২১. বিজ্ঞানে বড় মানুষ বড় কাজ : স্বপন কুমার গায়েন
২২. বিজ্ঞান ও মানুষ : আবদুল্লাহ আল-মুতী
২৩. এ যুগের বিজ্ঞান : আবদুল্লাহ আল-মুতী
২৪. বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান : এ. এম. হারুন-অর রশীদ